মানুষ অমানুষ

bnebookspdf.com

কাসেম বিন আবুবাকার

বাংলা বই ডাউনলোড

bdeboi.com

bnebookspdf.com

facebook.com/bnebookspdf

fb.com/groups/bnebookspdf

bdeboi.com

প্রকাশক
আবুল কালাম আজাদ
অনুভব প্রকাশন
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তৃতীয় মুদ্রণ ঃ মার্চ- ২০০১
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ আগস্ট ১৯৯৫
প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

কম্পিউটার কম্পোজ
চলন্তিকা কম্পিউটার
১৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা

ISBN-984-8237-19-4

ভূমিকা

"আল্লাহর নামে শুরু করছি"

পৃথিবীতে ভাল-মন্দ মানুষ নিয়েই সমাজ। তাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা শয়তানের প্রলোভনে পড়ে মানবতা বিসর্জন দিয়ে অমানুষে পরিণত হয়েছে। এরা যে শুধু মূর্খ, তা নয়, এদের মধ্যে অনেকে জ্ঞানী-গুণীজনও আছেন। এই শ্রেণীর মানুষ খুব হিংস্র ও লোভী হয়। তাদের অবস্থা অনেকটা প্রবাদ বাক্যের মত— "চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী।" এই কাহিনীটা পড়লে উল্লিখিত কথাগুলোর সত্যতা জানতে পারবেন।

ওয়াস সালাম

লেখক

২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০১ বাংলা

২৫শে জিলহজ্জ ১৪১৪ হিজরী

৫ই জুন ১৯৯৪ ইং

bnebookspdf.com

লেখকের অন্যান্য বই

কাংখিত জীবন
চেনা মেয়ে
অবাঞ্ছিত উইল
বালিকার অভিমান
সংসার
বাসর রাত
অলৌকিক প্রেম
ফুটন্ত গোলাপ
বিলম্বিত বাসর
আধুনিকা
কালো মেয়ে
প্রেম বেহেস্তের ফল
শরীফা
অবশেষে মিলন
পাহাড়ী ললনা
বিদেশী মেম
বিয়ের খোঁপা
প্রতীক্ষা
ক্রন্দসী প্রিয়া
কি পেলাম
প্রেমের পরশ
একটি ভ্রমর পাঁচটি ফুল
শ্রেয়সী
বিদায় বেলায়
প্রেম

banglebookspdf.com

উৎসর্গ

স্নেহাস্পদ খায়রুল—ফাতেমা ও তাহমীনা

bnebookspdf.com

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, মেষের পালের মধ্যে দুইটি ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র ছাড়িয়া দিলে যেরূপ তাহারা উহাদিগকে ধ্বংস করে, তাহা হইতেও অধিক ধ্বংসকারী মানুষের ধন-সম্পত্তির লালসা এবং ধর্মকার্যে সুখ্যাতির লালসা।

— তিরমিজী

এক

গ্রীষ্মের দুপুর। প্রখর সূর্য-কিরণে ঢাকা শহরের পীচঢালা পথ তেতে আগুনের মত গরম হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও পীচ গলতে শুরু করেছে। অবশ্য তাতে শহরের লোকের চলাফেরার অসুবিধে হচ্ছে না। কারণ গরিব-ধনী সবার জন্য সব রকমের যানবাহন রয়েছে। নিতান্ত যাদের হাঁটা ছাড়া কোন উপায় নেই, তারাই শুধু হাঁটছে। তাও সবার পায়ে জুতো। তবে খালি পায়ে যে কেউ হাঁটছে না, তা নয়। তারা হল, ফকির-মীসকিন ও ঠেলাওয়ালাদের কিছু লোক।

বেলা তখন একটা। আরিফ মহাখালী কলেরা হাসপাতালের ভিতরের গেটের বাইরে বন্ধু আবসারের পাশে বসে আছে। গরমে গায়ের জামা-কাপড় ঘামে ভিজে যাচ্ছে। যেখানে রুগীদের লোকজন বসে অপেক্ষা করে, সেখানে কয়েকটা বেঞ্চ থাকলেও ফ্যান নেই। মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা না থাকায়, একজায়গাতেই সবাই বসে আছে। এখানে যারা রয়েছে, তাদের কারো না কারো আত্মীয়ের ডাইরিয়া অথবা কলেরা হয়েছে।

এক সময় আরিফ আবসারকে বলল, তুই বাসায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে ভাবীর ও খালা-আম্মার ভাত নিয়ে আয়। চিন্তা করিস না, আমি তো আছি।

আবসার বলল, তাই যাই, যা গরম পড়েছে, আর একবার গোসলও করব। তারপর সে চলে গেল।

আজ ভোর থেকে আবসারের বাবা খায়ের সাহেবের বেশ কয়েকবার পাতলা পায়খানা ও বমি হয়েছে। বাসায় ডাক্তার এনে চিকিৎসা করানোর পরও যখন পাতলা পায়খানা ও বমি বন্ধ হল না তখন ডাক্তার মহাখালী কলেরা হাসপাতালে নিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। কিন্তু খায়ের সাহেব রাজি হননি। বললেন, এই অসুখে আমার মৃত্যু লেখা থাকলে, হাসপাতালে নিয়ে গেলেও তা হবে। সেখানে ডাক্তার-নার্সদের হাতে আমি মরতে চাই না। শেষে বেলা এগারটার পর যখন পায়খানা ও বমি ঘন ঘন হতে লাগল এবং হাতে-পায়ে খিচুনী এসে গেল তখন বড় ছেলে আবসার ও তার স্ত্রী রীমা তাকে জোর করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। সঙ্গে আবসারের মা আকলিমা বেগমও এসেছেন।

ভার্সিটিতে জুওলজীতে অনার্স পড়ার সময় আরিফের সঙ্গে আবসারের বন্ধুত্ব হয়। অনার্স পাস করে আবসার বাবাকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য চাকরি করছে। আর আরিফ মাস্টার্স করছে।

খায়ের সাহেব গাইবান্ধার লোক। ঢাকায় একটা প্রাইভেট ফার্মে ভাল পোস্টে আছেন। কিন্তু সৎ হওয়ার কারণে ফ্যামিলীসহ ঢাকায় থাকা এবং চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ের পড়াশুনার খরচ চালাতে খুব হিমশিম খাচ্ছিলেন। আবসার চাকরিতে ঢুকতে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন।

আকলিমা বেগম হার্টের রুগী। আজকাল শহরে কাজের মেয়ে পাওয়া যায় না। কিশোরী, তরুণী ও যুবতীরা গার্মেন্টিসে চাকরি করে। অসুস্থ শরীর নিয়ে আকলিমা বেগম সংসারের সব কাজ করেন। তাই খায়ের সাহেব আবসারের বিয়ে দিয়েছেন। আবসারের এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল না। মায়ের জন্য একরকম করতে বাধ্য হয়েছে। তবে বাবা-মা বিয়ে দিলেও পাত্রী নিজে সিলেক্ট করেছে। অফিসে যাবার পথে প্রায় মেয়েটির সাথে আবসারের দেখা হত। কোন কোন দিন ফেরার সময় তাকে

তাদের বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখত। তখন আবসারের মনে হত, মেয়েটি যেন তাকে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। কয়েক বার চোখে চোখও পড়েছে। প্রথম দিন আবসার লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে হাঁটতে থাকে। কিছু দূর আসার পর আবসারের মনে হল, মেয়েটি তার দিকে চেয়ে আছে। অনুমানটা যাচাই করার জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, সত্যিই তাই । আবসার ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে চলে আসে। কয়েক বছর কলেজ-ভার্সিটিতে পড়লেও কোন মেয়েকে নিয়ে তেমন কিছু ভাবেনি। অফিসে জয়েন করার পর এই মেয়েটা তাকে মাঝে মাঝে ভাবায়। মেয়েটার গায়ের রং ফর্সা হলেও ফেস কাটিং ভাল নয়। চোখ দুটো কেমন ভাসা ভাসা—নাক চেপ্টা—ঠোঁট মোটা। তবে শরীরের বাঁধন ভাল, সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা, দোহারা শরীর। সর্বোপরি তার উন্নত বক্ষ দুটো দারুণ। হাঁটার সময় ভারী নিতম্বের উত্থান-পতন যে কোন বয়সের পুরুষের মনকে নাড়া দেয়। বন্ধু আরিফের কাছে শুনেছে, যে সব মেয়েদের ফেসকাটিং খারাপ কিন্তু দেহের গঠন ভাল, তারা সাধারণত ঠাণ্ডা মেজাজের হয়, এবং খুব স্বামীভক্ত হয়। মেয়েটিকে দেখার পর থেকে আবসারের প্রায় মনে হয়, একে বিয়ে করলে মন্দ হয় না। আবার চিন্তা করে, এরকম মেয়েকে কি মা-বাবা পছন্দ করবে? একদিন অফিসে যাবার সময়ে এইসব ভাবতে ভাবতে একসময় নিজে নিজে শব্দ করে হেসে উঠল।

একজন বয়স্ক পথিক পাশ দিয়ে যাবার সময় আবসারের হাসি শুনে জিজ্ঞেস করলেন, কি হল দাদু, একা একা হাসছেন যে?

আবসার লজ্জা পেয়ে হাসি থামিয়ে বলল, না দাদু, কিছু হয়নি, একটা হাসির কথা মনে পড়ল, তাই হাসলাম।

পথিক বললেন, এখনই তো আপনাদের হাসবার বয়স।

আবসার আর কিছু না বলে হাঁটতে শুরু করল।

এভাবে ছয় মাস কেটে গেল। একদিন আকলিমা বেগম আবসারকে বললেন, এই শরীর নিয়ে আমি আর তোদের সংসার টানতে পারছি না। তুই এবার বিয়ে কর। মায়ের কথা শুনে আবসার চিন্তা করল, চাকরি করে বাবাকে সাহায্য করছি, বিয়ে করে একটা মেয়েকে আনলে মাকেও সাহায্য করা হবে। তখন তার ঐ মেয়েটির কথা মনে পড়ল। একদিন মেয়েটির ব্যাপারে আলাপ করার জন্য আরিফের বাসায় গেল।

সালাম ও কুশলাদি বিনিময়ের পর আরিফ জিজ্ঞেস করল, কিরে চাকরি জীবন কেমন কাটছে?

আবসার বলল, কাটছে এক রকম। তা তুই আর আমাদের বাসায় যাস না কেন?

ঃ আজ যাব মনে করেছিলাম। তুই যখন এসে পড়লি তখন আর যাব না।

ঃ আমি এসেছি তো কি হয়েছে, আমার সঙ্গেই না হয় যাবি।

ঃ তা না হয় যাব; কিন্তু তুই হঠাৎ কি মনে করে এলি?

ঃ কেন, তোর কাছে কি আগে কোন দিন আসিনি?

ঃ এসেছিস; চাকরি করার পর আজ প্রথম এলি তো, তাই বললাম। এবার আসার কারণটা বলে ফেল দেখি?

ঃ আমি তো কারণ ছাড়াই কতবার এসেছি, তবু জিজ্ঞেস করছিস কেন?

ঃ তা এসেছিস; কিন্তু আজ কোন কারণে যে এসেছিস, তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

ঃ সত্যি আরিফ, তোর কথা শুনে মাঝে মাঝে আমি খুব অবাক হয়ে যাই। কি করে যে তুই মানুষের মনের কথা জানতে পারিস? ভার্সিটিতে পড়ার সময় যেদিন ইলেকসন

হল, তার দু'দিন আগে যখন ছাত্র লীগের নেতা বাসিত ভাই ইলেকসনের ব্যাপারে কথা বলে চলে যেতে উদ্যত হল তখন তুই তাকে বললি, বাসিত ভাই, ইলেকসনে ইন্‌শাআল্লাহ আপনি জিতবেন। একটা অনুরোধ রইল, ঐদিন আপনি একাকী কোথাও যাবেন না। বাসিত ভাই ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল। কিন্তু ঐ দিন বাসিত ভাই একাকী কোথায় যেন যাচ্ছিলেন, সেই সময় অন্য পার্টির ছেলেদের আক্রমণে বাসিত ভাই একটা পা হারালেন এবং ইলেকসনে জয়ীও হলেন। আরো এমন অনেক কথা তুই মাঝে মাঝে আমাকে বলেছিস, যেগুলো সত্যি ঘটেছে। কি করে জানতে পারিস— বলবি?

আরিফ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, কি করে বলি আমি নিজেই জানি না, তোকে বলব কি করে? ওসব কথা বাদদে, আজ মনটা ভাল নেই তাই তোদের বাসায় যাব মনে করেছিলাম। এবার তোর আসার কারণটা তাড়াতাড়ি বলে ফেল।

ঃ আগে তুই বল, তোর মন খারাপ কেন?

ঃ গতকাল চিঠি এসেছে, আম্মার শরীর খারাপ। আব্বা যেতে বলেছে। ভাবছি, দু'এক দিনের মধ্যে যাব।

ঃ তাই যাস। এখন আমাদের বাসায় যাবি, না বকবক করবি?

ঃ আজ আর তোদের বাসায় যেতে মন চাইছে না, তার চেয়ে দু'জনে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যাই চল। আচ্ছা, তুই আসল কথাটা বলছিস না কেন?

ঃ তুই অন্যের মনের কথা জানতে পারিস, আমারটা পারছিস না?

ঃ দেব এক থাপ্পড়, এমন কথা আর বলবি না। মানুষের মনের কথা একমাত্র আল্লাহপাক ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। এই কথা বলে একটা হাত তুলে এগিয়ে এল।

আবসার সরে গিয়ে বলল, সত্যি সত্যি তুই থাপ্পড় মারবি নাকি? তোর ক্যারাতি হাতের থাপ্পড় খেলে হাসপাতালে যেতে হবে। আরিফ যে ক্যারাতে পারদর্শী, আবসার তা জানে।

আরিফ হেসে উঠে হাত নামিয়ে বলল, তুই এখনো ভীতুই রয়ে গেলি।

ঃ তা না হয় আমি ভীতু; কিন্তু মাঝে মাঝে যা বলিস, তা তো সত্যি হয়।

আরিফ হাসতে হাসতেই বলল, আরে বোকা, আমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ি, আর সেটা ঠিক জায়গায় লেগে যায়। নে এবার বলে ফেল।

আবসার বলল, একটা মেয়ের প্রতি দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছি। তাকে যত মন থেকে সরাতে চাই, তত জেঁকে বসে যাচ্ছে।

আরিফের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। বলল, তাই নাকি! তা মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?

ঃ না।

ঃ নাম-ধাম জানিস?

ঃ নাম জানি না; তবে ধাম জানি। তাদের বাসার সামনে দিয়ে আমার অফিসে যাবার রাস্তা।

ঃ মেয়েটাকে যখন পছন্দ তখন তার সবকিছু জেনে তোর বাবা-মাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে বল। তা হ্যাঁরে, মেয়েটা নিশ্চয় দেখতে-শুনতে ভাল?

ঃ দেখতে ভাল নয়; তবে রং ফর্সা। আর দেহের গঠন খুব সুন্দর।

ঃ আমাকে দেখাতে পারবি?

ঃ কেন পারব না। প্রতিদিন অফিসে যাবার পথে দেখা হয়। কোন কোন দিন ফেরার সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি।

ঃ কাল সকালে তোদের বাসায় যাব। এখন চল বেড়াতে যাই। ওমরকে দু'কাপ চা আনতে দেখে আবসারকে জিজ্ঞেস করল, নাস্তা দিতে বলব নাকি?

ঃ নাস্তা খেয়ে বেরিয়েছি, শুধু চা হলেই হবে।

চা খেয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ চিড়িয়াখানা ঘুরে ঘুরে দেখল, তারপর বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঢুকে একটা গাছের ছায়ায় বসল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আরিফ বলল, তোর মানসীর কথা বল।

ঃ তার সম্বন্ধে যা বলেছি, তার বেশি কিছু জানি না।

ঃ তুই তো বললি, মেয়েটা দেখতে ভাল নয়; তবু তাকে তোর পছন্দ হল কেন?

ঃ তা বলতে পারব না। সে যদি সুন্দরী হত, তাহলেও হয়তো পছন্দ হত। মেয়েটার ফেসকাটিংটাই যা খারাপ; অন্যান্য সবকিছু সুন্দর। তুই তো একদিন বলেছিলি, যে মেয়ে দেখতে খারাপ, সে সাধারণত ঠাণ্ডা মেজাজের হয়, খুব স্বামীভক্ত হয়।

ঃ তা অবশ্য বলেছিলাম, তাই বলে সবাই যে ঐরকম হবে, তা ঠিক নয়। এক কাজ কর, তুই দু'একদিনের মধ্যে তার সঙ্গে আলাপ করে তার মনোভাব বোঝার চেষ্টা কর। তারপর না হয় একদিন তোদের বাড়িতে যাব। মেয়েটা যদি তোকে পছন্দ না করে, তাহলে আমি আর তাকে দেখে কি করব?

ঃ কথাটা তুই মন্দ বলিসনি, ঠিক আছে, আমি তার সঙ্গে আলাপ করে দেখি, তারপর তোকে জানাব।

ঃ হ্যাঁ তাই কর। আমার মনে হয় সেটাই ঠিক হবে। ততদিনে আমিও বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

ঃ তাই ঘুরে আয়। এবার চল ফেরা যাক।

পরের দিন আবসার অফিসে যাবার সময় মেয়েটিকে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তার কাছে এসে বলল, কিছু যদি মনে না করেন, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

মেয়েটি এক পলক আবসারের দিকে চেয়ে দৃষ্টি নত করে বলল, বলুন কি বলবেন।

ঃ আপনি প্রতিদিন ঠিক এই সময়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন?

মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনিই বা আমাকে এই কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

ঃ প্রথমে আপনার অনুমতি নিয়ে আমি প্রশ্ন করেছি, আমার উত্তরটা আগে দিন, পরে আপনারটা দেব।

ঃ যদি না দিই?

ঃ না দিলে তো জোর করতে পারব না, তবে আশা করেছিলাম দিবেন।

মেয়েটি মৃদু হেসে বলল, আশা যখন করেছিলেন তখন নিরাশ করা ঠিক হবে না। একজনের জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করি। এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

ঃ আমি এই উত্তরটাই অনুমান করেছিলাম, তাই জিজ্ঞেস করলাম। আপনার নামটা জানতে পারি?

ঃ নাম জানার কি দরকার?

ঃ দরকার থাকতেও তো পারে।

ঃ অপরিচিত কোন মেয়ের নাম জানতে চাওয়া কিন্তু অভদ্রতা।

ঃ তা ঠিক, তবে পরিচয় হবার পর নাম জানতে চাওয়া অভদ্রতা নয়।

ঃ আপনার কথাও ঠিক; কিন্তু আমাদের মধ্যে তো এখনো পরিচয় হয়নি।

ঃ আলাপের মধ্যে দিয়েই পরিচয় হয়। অবশ্য আপনি যদি পরিচয় করতে না চান, তাহলে অন্য কথা। আমি বোধ হয় অন্যায় করে ফেললাম, মাফ করবেন। এবার আসি তাহলে, বলে আবসার চলতে শুরু করল।

ঃ দাঁড়ান চলে যাচ্ছেন কেন? মনে হচ্ছে রাগ করেছেন?

আবসার দাঁড়িয়ে পড়ল।

মেয়েটি এগিয়ে এসে বলল, চলুন যেতে যেতেও আমরা পরিচিত হতে পারি। অল্পক্ষণ হাঁটার পর আবসার বলল, আপনি কিন্তু এখনো নাম বলেননি।

ঃ রীমা। আপনার?

আবসার নাম শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

ঃ কি হল? ওভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন কেন? নাম বলবেন না?

আবসার মৃদু হেসে নাম বলে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

ঃ কিছু বললেন না যে?

ঃ আপনার নামের অর্থ জানেন?

ঃ না।

আবসার আবার মৃদু হেসে চুপ করে হাঁটতে লাগল।

রীমা তাকে দু'বার হাসতে দেখেছে। জিজ্ঞেস করল, আমার নাম শুনে হাসলেন কেন?

ঃ আপনার ভাল নাম কি?

ঃ আসমা হোমায়রা।

আবসার এবার শব্দ করে হেসে উঠে বলল, ওটারও নিশ্চয় মানে জানেন না?

ঃ না, জানি না। মনে হচ্ছে, আমার নামের মধ্যে কিছু ব্যাপার-স্যাপার আছে। তা না হলে দুটো নাম শুনেই হাসবেন কেন?

ঃ তা আছে; তবে শুনলে আপনি মাইণ্ড করবেন।

ঃ না মাইণ্ড করব না, আপনি বলুন।

ঃ আপনার ডাকনামের অর্থ হল—সুন্দরী স্ত্রী। আর ভাল নামের অর্থ হল—অতুলনীয় সুন্দরী।

এবার রীমা তার পথ আগলে বেশ রাগের সঙ্গে বলল, সত্য বললেন, না বিদ্রূপ করছেন?

ঃ জানতাম আপনি মাইণ্ড করবেন। সত্য মিথ্যা জানতে হলে কষ্ট করে কারো কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন, আপনাকে বিদ্রূপ করিনি।

ঃ আপনার নামের অর্থ নিশ্চয় জানেন?

ঃ আমার পুরো নাম রাগীব আবসার। তার অর্থ হল—আকাঙ্খিত দৃষ্টি।

রীমা কিছু না বলে চলতে শুরু করল।

আবসারও চলতে শুরু করে বলল, কিছু বলছেন না যে?

ঃ আপনি বোধ হয় কোন অফিসে চাকরি করেন?

ঃ হ্যাঁ। আপনি?

ঃ একটা গার্মেন্টসের সুপারভাইজার।

ঃ কোথায়?

ঃ বাস স্ট্যান্ডের অপজিট গলিতে। আপনি তো বাসে উঠবেন?

ততক্ষণে তারা বাস স্ট্যান্ডে এসে পড়েছে।

ঃ হ্যাঁ। তারপর একটা বাস আসতে দেখে বলল, আজ তাহলে আসি, কাল আবার দেখা হবে। এমন সময় বাস এসে থামলে আবসার আল্লাহ হাফেজ বলে বাসের দিকে এগোল।

রীমাও আল্লাহ হাফেজ বলে তার দিকে চেয়ে রইল। বাসটা চলে যেতে সেও নিজের পথে রওয়ানা দিল।

ঐদিন ফেরার পথে আবসার দেখল, রীমা তাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। সেদিকে তাকাতে চোখে চোখ পড়ে গেল। আবসার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে চলে এল।

পরের দিন অফিস টাইমের কিছু আগে আবসার রওয়ানা দিল। ভাবল, আজ রীমাকে তার মনের কথা জানাবে। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাছে এসে সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন?

রীমা সালামের উত্তর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

আবসার তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, আমার উপর রেগে আছেন মনে হচ্ছে?

ঃ কি করে বুঝলেন?

ঃ কিছু বলছেন না বলে।

ঃ বললে শুনবেন?

ঃ বলেই দেখুন।

ঃ আপনার ক্ষতি হতে পারে।

ঃ তা হোক তবু বলুন।

ঃ তাহলে আসুন আমার সঙ্গে। তারপর একটা খালি রিক্সা দাঁড় করিয়ে বলল, এই রিক্সা, রমনা পার্কে যাবে?

রিক্সাওয়ালা 'না' বলে চলে গেল।

আবসার বলল, আমরা তো এক রিক্সায় যেতে পারি না।

রীমা বেশ অবাক হয়ে বলল, কেন?

ঃ পাশাপাশি বসার অধিকার এখনো আমাদের প্রতিষ্ঠা হয়নি।

ঃ আমি তো সে অধিকার আপনাকে দিচ্ছি।

ঃ আপনি দিলে তো হবে না। অধিকার দিতে হলে আইনের মাধ্যমে দিতে হবে।

এমন সময় একটা খালি বেবী আসতে দেখে আবসার হাত বাড়িয়ে থামাল। তারপর রীমাকে বলল, নিন উঠুন। বেবীতে বসে ড্রাইভারকে বলল, রমনা পার্কে চল। পার্কের গেটে বেবী বিদায় করে রীমাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। এ সময় পার্কে ভীড় একটু কম থাকে। তারা একটা গাছের তলায় বসল।

রীমা বলল, তখন আইনের কথা কি বললেন, বুঝলাম না।

আবসার বলল, না বোঝার তো কথা নয়। যদি সত্যি সত্যি বুঝতে না পেরে থাকেন, তাহলে না বোঝাই ভাল।

ঃ কেন?

ঃ গতকালের মত মাইণ্ড করবেন।

ঃ মাইণ্ড করলে আজ আপনার সঙ্গে দেখাই করতাম না। এখন বলুন কি বলতে চাচ্ছেন?

ঃ আইন বলতে আমি বিয়ের কথা বলতে চাচ্ছি। একমাত্র নিজের স্ত্রী ছাড়া বেগানা নারী-পুরুষ পাশাপাশি বসতে পারে না।

রীমা বলল, আপনি কতদূর লেখাপড়া করেছেন?

ঃ বি. এ. পাস করেছি। আরো পড়ার ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না।

ঃ তবু একথা বলতে পারলেন?

ঃ এটা আমার কথা নয় আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দঃ)-এর। কোন মুসলমানের তাঁদের আইন অমান্য করা উচিত না।

ঃ এবার আমি একটা প্রশ্ন করব, মাইন্ড করবেন না তো?

ঃ না করব না, বলুন কি বলবেন?

ঃ কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেননি?

ঃ আগে কখনো করিনি। তবে ইদানিং একটা মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছি।

ঃ মেয়েটা জানে?

ঃ তা এখনো বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে ঐ একই প্রশ্ন করি?

ঃ তা করতে পারেন। কিন্তু আমার মত মেয়ের দিকে কে নজর দেবে?

ঃ যদি কেউ দেয়?

ঃ তাহলে ভাববো, তিনি অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন। আমি কারো অনুগ্রহের পাত্রী হতে চাই না।

ঃ যদি সত্যি সত্যি কেউ ভালবাসে?

ঃ সে রকম হলে ভাববো সেটা আমার সৌভাগ্য।

ঃ যদি বলি আমি আপনাকে ভালবাসি।

ঃ বিদ্রূপ, না ঠাট্টা?

ঃ কোনটাই নয়, সত্যি বললাম।

bdeboi.com

ঃ প্রমাণ দেখাতে পারবেন?

ঃ নিশ্চয়। বলুন কি প্রমাণ দেখতে চান?

ঃ এক্ষুনি আমাকে বিয়ে করতে পারবেন?

আবসার এতটা আশা করেনি, কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে হাসিমুখে বলল, আমার কোন আপত্তি নেই, তবে তার আগে বাবা-মাকে জানাতে হবে।

ঃ কেন? আপনার ব্যক্তিত্ব নেই?

ঃ আছে বলেই তো এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম।

ঃ তাহলে বাবা-মার কথা বললেন কেন? তারা যদি আমাকে দেখে অপছন্দ করেন?

ঃ তারা তো বিয়ে করছে না, করছি আমি।

ঃ তবু তাদেরকে জানাতে চাচ্ছেন কেন?

ঃ এটা জানান সন্তানের কর্তব্য।

ঃ তারা যদি রাজী না হন?

ঃ রাজী হবার চান্স নব্বই পার্সেন্ট।

রীমা কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, আমার মত মেয়ের পেছনে লাগলেন কেন? আপনার আত্মীয়রা ছি-ছি করবেন।

ঃ সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ঃ ব্যক্তিগত ব্যাপারটাই আমি জানতে চাই।

ঃ আমার কাছে তুমি, সরি, আপনি আপনার নামের মত অতুলনীয় সুন্দরী।

ঃ আমাকে তুমি করেই বলবেন। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, জানি না আমার ভাগ্যে কি আছে।

ঃ ভাগ্যে যা আছে তা হবেই। সেটাকে নিয়ে অত দুশ্চিন্তা করছ কেন? আমাকে কী বিশ্বাস করতে পারছ না?

ঃ সে কথা পরে বলব, আপনি কি আমাদের ফ্যামিলির খোঁজখবর নিয়েছেন?

ঃ না, নিইনি। কারণ সে সবের প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনি।

ঃ কথাটা কি ঠিক বললেন? যাকে জীবন সঙ্গিনী করতে চাচ্ছেন, তার সবকিছু জানা উচিত।

ঃ তাহলে আমারও সবকিছু তোমার জানা উচিত? প্রথমে তোমারটা বল্ তারপর আমারটা বলব।

রীমা বলতে শুরু করল, আমার বাবারা পাঁচ ভাই। বড় আর ছোট বেঁচে আছেন। আমার বাবা সকলের ছোট। আমাদের দেশের বাড়ী কিশোরগঞ্জে। বাবা বি.এ. পাস করে স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। জমি-জায়গা যা ছিল তাতে বেশ ভালভাবে সংসার চলে যাচ্ছিল। আমরা পাঁচ বোন তিন ভাই। দু'বোন সবার বড়। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তারপর বড় ভাই। সে প্রেম করে বিয়ে করেছে। ভাবীর সঙ্গে মায়ের বনিবনা হয় না। তাই সে অন্য জায়গায় বাসা ভাড়া করে থাকে। সেজ বোনেরও বিয়ে হয়ে গেছে। তারপর আমি। আমার পর ছোট দু'টো ভাই এক বোন আছে। তারা লেখাপড়া করছে। সংসার বেড়ে যাওয়ার ফলে সংসারে আর্থিক অনটন দেখা দেয়। সেই সময় বাবা তার এক বন্ধুর কথায় ঢাকাতে এসে কন্ট্রাকটারী শুরু করেন। টাকার প্রয়োজনে দেশের বাড়ীর অনেক জমি-জায়গা বিক্রি করে দেন। কিন্তু সেই বন্ধুর খপ্পরে পড়ে বাবা কন্ট্রাকটারী করতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। আমি এস. এস. সি. পাস করেছিলাম। ভাগ্যচক্রে এই চাকরিটা পেয়ে যাই। এখন আমার উপার্জনে কোন রকমে সংসার চলে যাচ্ছে। অবশ্য বড় ভাই আমাদের বাসাভাড়ার টাকাটা দেয়। মেজ ভাইটাকে পড়া ছাড়িয়ে কয়েক মাস হল আমি আমাদের গার্মেন্টিসে লাগিয়েছি। আমার পরিচয় তো শুনলেন, এখন ভেবে দেখুন কি করবেন।

আবসার বলল, আমার ভাববার কিছু নেই। আমি তো তোমার পরিচয় না জেনেই তোমার কথায় রাজি হয়েছি। এবার আমারটা শোন, আমার বাবা একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করেন। আমরা চার ভাই দু'বোন। আমিই বড়। বি. এ. পাস করার পর চাকরি করে বাবাকে সাহায্য করছি। আমার ছোট যে বোন তার বিয়ে হয়ে গেছে। আর বাকি তিন ভাই ও সকলের ছোট বোন সবাই পড়াশুনা করছে। মা একা সংসার টানতে পারছে না বলে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে। মায়ের মুখে বিয়ের কথা শুনে তোমার কথা আমার মানসপটে ভেসে উঠে। তখনই সিদ্ধান্ত নিই তোমাকে বিয়ে করব।

রীমা বলল, আপনার মত ছেলের কথা শুনলে অনেক ভাল মেয়ের বাবা বিয়ে দিতে আগ্রহী হবে। তাদের কোন মেয়েকে বিয়ে করলে, সুন্দর মেয়ের সঙ্গে আরো অনেক কিছু পাবেন। অপর পক্ষে আমি দেখতে খারাপ এবং আমার বাবা গরিব। তিনি তো কিছুই দিতে পারবেন না।

আবসার বলল, তোমার কথা অবশ্য ঠিক। কিন্তু শ্বশুর বাড়ী থেকে কিছু পাওয়ার কথা কোন দিন চিন্তা করিনি। মনে মনে জীবন সঙ্গিনী করার জন্য যে মেয়েকে খুঁজছিলাম, সে তুমি। ব্যাস, তোমাকে ছাড়া আর কিছু চাই না। তোমাকে পছন্দ হবার পর আমার এক বন্ধুকে জানাই। সে শুনে আমাকে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে বলে মতামত জানতে বলল। মতামত জানার পর সে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

রীমা বলল, আপনার বন্ধুর নাম কি?

ঃ আরিফ, তুমি এখনো আমাকে আপনি করে বলছ কেন?

রীমা তার কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তিনি কি করেন?

ঃ এ বছর জুওলজিতে মাস্টারস পরীক্ষা দিবে।

ঃ বাড়ী কেথায়?

ঃ সিরাজগঞ্জ জেলার সমেশপুর গ্রামে। খুব বড়লোকের ছেলে। একটা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে।

ঃ তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান কেন?

ঃ তোমার কথা বলে আমিই তাকে তোমাকে দেখাতে চেয়েছিলাম। শুনে ঐ কথা বলল।

ঃ তিনি বড়লোকের ছেলে, আমাকে দেখলে এক কথায় নাকচ করে দিবেন।

ঃ বড়লোকের ছেলে হলেও তাকে দেখলে কেউ তা ভাবতে পারবে না। খুব সিম্পল থাকে। গরিবদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল। অনেক গরিব ছাত্রকে সাহায্য করে। ভার্সিটিতে অনার্স করার সময় তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। যেমন চেহারা তেমনি তার চরিত্র। এরকম ছেলে হঠাৎ দেখা যায় না। ওর মধ্যে এমন কিছু গুণ আছে, যা তুমি শুনলে খুব অবাক হবে।

ঃ যেমন?

ঃ ও অনেকের সম্বন্ধে এমন কমেন্ট করে, যা দু'দিন আগে হোক আর পরে হোক ঘটবেই। তবে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে খুব রেগে গিয়ে বলে, আল্লাহ ছাড়া কেউ ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে না। কিন্তু মাঝে-মধ্যে ও নিজেই বলে ফেলে। তোমার কথা বলতে বলল, মনে হচ্ছে মেয়েটা ভালই হবে। তাকে বিয়ে করলে তুই সুখী হবি।

ঃ তাই নাকি? তাহলে তো তার সঙ্গে আলাপ করতেই হয়।

ঃ তুমি না চাইলেও সে করবে বলেছে। একদিন আলাপ করার ব্যবস্থা করব। এখন তোমাকে একটা কথা বলি— শোন। আমি কিছুদিনের মধ্যে তোমাকে ঘরে নিতে চাই, তোমার কি মত বল?

ঃ আমার মতের আগে আপনার বাবা-মা আমাকে দেখে কি বলেন দেখুন।

ঃ তুমি তাহলে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?

ঃ আমাকে ভুল বুঝবেন না। উনাদের মতামতেরও একটা দাম আছে।

ঃ তা আছে। তবে সেটা আমি বুঝব। আমি শুধু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই, তুমি রাজী আছ কি না।

ঃ বেশ আপনার কথাতে আমি রাজি। কিন্তু ভবিষ্যতে আমাকে নিয়ে সংসারে অশান্তি হবে কিনা সে ব্যাপারে আপনাকে একটু চিন্তা করার জন্য অনুরোধ করছি।

ঃ তুমি অবশ্য ভাল কথা বলেছ। তবে আমি আগেই সবকিছু চিন্তা-ভাবনা করে তোমার কাছে প্রস্তাব রেখেছি। চল, এবার তাহলে উঠা যাক।

ঃ হ্যাঁ, তাই চলুন—বলে রীমা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার তো অফিস কামাই করে দিলাম। কোন অসুবিধা হবে না?

ঃ না হবে না। তোমার সঙ্গে কথা বলব বলে আজ ছুটি নিয়েছি। কিন্তু তোমার তো অফিস কামাই হল।

ঃ তা হল, তবে তেমন অসুবিধা হবে না।

ঃ একটা কথা বললে রাগ করবে না তো?

রীমা অল্পক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে বোঝার চেষ্টা করল, তার কোন খারাপ উদ্দেশ্য আছে কি না। কিন্তু সফল হল না! বলল, রাগের কথা শুনলে রাগ করাই তো স্বাভাবিক।

ঃ তা ঠিক, বলছিলাম তুমি পাশে বসার অধিকার দিতে চেয়েও আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছ।

রীমা যেন তার কথার মধ্যে নোংরামির গন্ধ পেল। ভাবল, আজকালের সব ছেলেরাই কি মুখে মিষ্টি কথা বলে ধোঁকা দিয়ে নারীদেরকে ভোগ করতে চায়? তার মনে প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মাল। সেই সঙ্গে খুব রাগও হল। রাগের সঙ্গেই বলল, আপনাকে অন্য দশটা ছেলের চেয়ে আলাদা মনে করেছিলাম। কিন্তু সে ধারণাটা আমার ভুল। যাক, আর কখনো আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেন না। এতক্ষণ একটা জানোয়ারের সঙ্গে কথা বলছিলাম জেনে ঘেন্না পাচ্ছে। কথা শেষ করে সে হনহন করে চলে যেতে লাগল।

আবসার তার কথা শুনে প্রথমে বেশ ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। তাকে চলে যেতে দেখে দ্রুত হেঁটে এসে তার পথ রোধ করে বলল, আমি কি অন্যায় করলাম, তা না বললে যেতে দিচ্ছি না।

রীমা রাগে লাল হয়ে বলল, পথ ছাড়ুন, নচেৎ চিৎকার করে লোকজন ডাকব। যারা ছোট লোক, ইতর, তারা লেখাপড়া করলেও তাই থেকে যায়।

আবসার রেগে গেলেও ধৈর্য হারাল না। সংযত স্বরে বলল, তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। তবু বলব, আমি কি ইতরামি করলাম, তা তোমাকে বলতেই হবে।

আবসারের কথায় রীমার রেগে যাবার কারণ হল— সে দেখতে খারাপ হলেও ছোট বেলা থেকে বেশ স্বাস্থ্যবতী। কিশোর বয়সেই তাকে তরুণী আর তরুণী বয়সে তাকে যুবতী দেখাত। যখন সে ক্লাস টেনে পড়ে তখন বাবা-মার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেশের বাড়ী যেত। তখন তারই চাচাতো ভাই জামাল তাকে বিয়ে করার প্রলোভন দেখিয়ে প্রথমে চুমু খেত। জামাল তখন ভার্সিটিতে পড়ে। সে সময় রীমা তার প্রলোভনে পড়ে কোন বাধা দেয়নি। কিন্তু একদিন যখন জামাল তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে খেতে এক হাতে বুকে হাত দিয়ে অন্য হাতে সালওয়ারের ফিতে খুলতে উদ্যত হল, তখন রীমা তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, তুমি এত নিচ জামাল ভাই, ছি, ছি, এ আমি কোনদিন ভাবিনি। তুমি একটা জঘন্য ইতর ছেলে— বলে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে তার ধারে-কাছে আর ঘেঁষেনি।

আজ আবার আবসারের মুখে সেই রকম ইঙ্গিত পেয়ে রীমার সেই কথা মনে পড়তে ভীষণ রেগে গেছে।

রীমাকে এতক্ষণ তার দিকে চেয়ে ভাবতে দেখে আবসার বলল, মনে হচ্ছে আমি কোথাও একটু ভুল করে ফেলেছি। যার ফলে তুমি রেগে গেছ এবং আমার প্রতি তোমার

ঘৃণা জন্মেছে। প্লীজ রীমা, শেষবারের মত তোমার কাছে অনুরোধ করছি, আমার সেই ভুলটা তুমি ধরিয়ে দাও।

রীমা তার কথা শুনে ভাবল, সেদিন জামালও ভুল স্বীকার করে বিয়ের আগে আর কখনো এরকম করবে না বলে ওয়াদা করে আবার কাছে টানতে চেয়েছিল। এখন আবসারের কথাগুলো তার ঐ রকম মনে হল। কোন উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে উদ্যত হল।

আবসার তার একটা হাত খপ করে ধরে বলল, জানি না কি কারণে তুমি আমাকে ইতর ভাবছ। তুমি না চাইলে..... ।

আবসার কথাটা আর শেষ করতে পারল না, ততক্ষণে রীমা অন্য হাতে খুব জোরে তার গালে চড় মেরে বলল, অসভ্য, ছোট লোক, ইতর, মেয়েদের পাশে বসতে নেই বলে ভালমানুষ সেজে নির্জনে পেয়ে তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে চাচ্ছ। হাত ছাড়াবার চেষ্টা করার সময় আবার বলল, ছেড়ে দিন বলছি, নচেৎ চিৎকার করে লোকজন ডেকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করব।

আবসার রীমার কথা শুনে ও তার স্পর্দ্ধা দেখে যেমন ভীষণ রেগে গেল তেমনি মর্মাহত হল। চিন্তা করল, সে এই সামান্য কথায় আমাকে ইতর ভেবে রেগে গেল কেন? হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল, জানি না কেন তুমি আমার সঙ্গে এরকম দুর্ব্যবহার করলে। তবু আমি কি বলতে চাচ্ছিলাম তা বলে চলে যাচ্ছি; তুমি আমাকে আপনি সম্বোধনে কথা বলছিলে, তাই তুমি করে বলার জন্য অনুরোধ করতে চাচ্ছিলাম। এতে যদি আমি ইতর, অভদ্র ও ছোট লোক হয়ে থাকি, তাহলে আর কিছু বলার নেই। আজ থেকে কোন দিন এতটুকু তোমাকে আর বিরক্ত করব না। আসি, আল্লাহ হাফেজ। কথা শেষ করে সে হন হন করে পার্কের গেটে এসে একটা রিক্সায় উঠে বাসার ঠিকানা বলল।

আবসারের কথা শুনে রীমার হুঁশ হল। সে এতক্ষণ আগের জীবনের কথা ভেবে বাস্তবে ছিল না। আবসারকে চলে যেতে দেখেও তাকে বাধা দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। একবার তার মনে হল, ছুটে গিয়ে আবসারের কাছে অপরাধের কথা স্বীকার করে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু তা কাজে পরিণত করতে পারল না। স্থানুবত দাঁড়িয়ে তার চলে যাওয়া দেখল। তারপর ধীরে ধীরে পার্কের গেটের দিকে আসতে লাগল। গেটের বাইরে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকে দেখতে না পেয়ে নিশ্চিত হল, সে চলে গেছে। তখন অনুশোচনায় তার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যে সামলে নিয়ে একটা রিক্সায় উঠে বাসার পথে রওয়ানা হল।

আবসার বাসায় ফেরার পথে চিন্তা করতে লাগল, রীমা নিশ্চয় এর আগে কোন ছেলের কাছে দুর্ব্যবহার পেয়েছে। তাই সে আমার কথা বুঝতে না পেরে আমাকে ভুল বুঝল। অপেক্ষা করে দেখা যাক, এরপর সে কি করে।

এদিকে রীমা ফেরার পথে ভাবল, আমি দেখতে খারাপ বলে কেউ আমাকে বিয়ে করতে না চাইলেও আমার স্বাস্থ্য ভাল বলে সবাই আমাকে ভোগ করতে চায়। রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করার সময় আবাল বৃদ্ধ আমার শরীরের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এমন কি আমার অফিসের কলিকদেরকেও লোভাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে দেখি। কিন্তু আবসারের চোখে সে রকম কিছু দেখিনি। তার সঙ্গে মাত্র দু'দিনের পরিচয় তাতেই মনে হয়েছে, অন্যদের মত তার দৃষ্টিতে সেরকম কিছু দেখিনি। যদি তা না হত, তাহলে এক কথায় বিয়ে করতে রাজী হত না। আমি ভুল বুঝে তার সঙ্গে খুব

খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছি। আচ্ছা, সে যে বলল, আর আমাকে বিরক্ত করবে না। তাহলে কি সত্যি সত্যি আমার সঙ্গে আর দেখা করবে না? আমাদের বাসার সামনে দিয়ে তো তার অফিসে যাওয়ার রাস্তা, দেখা নিশ্চয় হবে। তবে সে হয়তো না দেখার ভান করে চলে যাবে। আমি যদি তার কাছে অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা চাই, তাহলে কি সে আমাকে ক্ষমা করবে না? বাসায় এসে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিল, কয়েকদিন অপেক্ষা করে দেখবে সে কি করে। তারপর না হয় একদিন তার কাছে ক্ষমা চাইবে।

পরের দিন থেকে আবসার অফিসে যাবার রাস্তা পরিবর্তন করল। যদিও এই রাস্তায় তার সময় বেশি লাগে তবু সে আগের রাস্তায় যাতায়াত বন্ধ করে দিল।

রীমা কয়েকদিন নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করে আবসারকে দেখতে না পেয়ে ভাবল, সে নিশ্চয় অন্য পথে যাতায়াত করছে। তাই একদিন বাসস্ট্যান্ডে এসে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর আবসারকে আসতে দেখে তার দিকে এগিয়ে গেল।

আবসার প্রথমে রীমাকে দেখতে পায়নি। রীমা কাছাকাছি এলে দেখতে পেয়েও না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। এমন সময় রীমার গলা শুনতে পেল, এই যে আবসার সাহেব, একটু দাঁড়ান না।

আবসার অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রীমা তার সামনে এসে বলল, সেদিনের দুর্ব্যবহারের জন্য আমি খুব দুঃখিত। যা করেছি তা ক্ষমার অযোগ্য। তবু ক্ষমা চাইছি, দয়া করে ক্ষমা করে দিন।

আবসার কোন কথা বলল না। এমন সময় বাস আসতে বাসের দিকে চলে গেল।

রীমা নিশ্চল হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। বাস চলে যাবার পর সে নিজের অফিসের দিকে রওয়ানা দিল।

পরের দিন রীমা অফিস টাইমের একটু আগে বাসা থেকে বেরিয়ে যেদিক থেকে গতকাল আবসারকে আসতে দেখেছিল, সেদিকে ধীরে ধীরে হেঁটে এগিয়ে যেতে লাগল। এক সময় আবসারকে আসতে দেখে পথ আগলে দাঁড়িয়ে রইল। কাছে এলে সালাম দিয়ে বলল, আবসার সাহেব একটু দাঁড়ান, কথা আছে।

আবসার সালামের জবাব দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ইতর ও ছোটলোকদের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। বলা তো যায় না, কখন ইতরামি করে ফেলি।

রীমা লজ্জা পেয়ে বলল, আপনার কথাটা সত্য। তবে যে তা নয়, তা কেউ যদি ভুল করে তাকে তাই মনে করে, এবং সে তার ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চায়, তাহলে তাকে ক্ষমা করা মহৎ গুণের পরিচয়, আপনি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন না? যদি ক্ষমা করার আগে প্রতিশোধ নিতে চান তাতেও আমি রাজি। তবু ক্ষমা পেতে চাই।

ঃ ইতরদের ক্ষমা করার মহৎ গুণ নাও থাকতে পারে।

ঃ তা হয়তো ঠিক। কিন্তু সত্যি সত্যি যে ইতর নয়, সে পারে।

তারপর রীমা এগিয়ে এসে তার দুটো হাত ধরে ছলছল চোখে বলল, সেদিন থেকে অনুশোচনার আগুনে জ্বলছি। আপনার কাছ থেকে ক্ষমা না পাওয়া পর্যন্ত সে আগুন নিভবে না।

আবসার বলল, ক্ষমা তোমাকে করতে পারি। তার আগে তুমি আমাকে 'তুমি' করে বলবে, আর সেদিন তুমি যে কারণে রেগে গিয়ে ঐসব বলেছ তা বলতে হবে।

রীমা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, বেশ তাই হবে। সে সব বলার জন্য সময়ের দরকার। সময় মত একদিন বলব। এবার বলুন ক্ষমা করেছেন?

আবসার বলল, সেদিন খুব মর্মাহত হয়েছিলাম ঠিক কথা, তবে তোমার ব্যবহারের কথা চিন্তা করে বুঝতে পেরেছিলাম, এর পিছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে। তাই সেদিনই মনে মনে ক্ষমা করেছি। তবে কারণটা জানার জন্য মন খুব উদগ্রীব হয়ে আছে।

রীমা ভিজে গলায় বলল, তোমার অনুমান ঠিক। আমার জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে, সে কথা মনে পড়লে আমি বিবেক হারিয়ে ফেলি। একদিন তোমাকে সে কথা বলব।

আবসার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, এবার চল, নচেৎ অফিসে পৌছতে দেরি হয়ে যাবে। কাল শুক্রবার। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে সেই বন্ধুর বাসায় যাব। সেই সময় তোমার সব কথা শুনব।

রীমা বলল, ঠিক আছে, তাই হবে।

bdeboi.com

দুই

শুক্রবার দিন আবসার রীমাকে নিয়ে একটা বেবী করে আরিফের বাসায় রওয়ানা দিল। রীমা বেবীতে বসে চাচাতো ভাইয়ের ঘটনাটা সংক্ষেপে বলে বলল, তুমি সেদিন যখন দূরে থাকার কথা বললে তখন সেই কথা মনে করে তোমার সঙ্গে ঐ রকম দুর্ব্যবহার করে ফেলি। সেদিন তুমি চলে যাবার পর লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। তারপর চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আবসারের একটা হাত ধরে বলল, তুমি যদি এখন আমার গালে চড় মেরে প্রতিশোধ নিতে, তাহলে হয়তো মনে শান্তি পেতাম।

আবসার বলল, মারবার আগেই তো কাঁদছ, মারলে তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। তারপর তার চোখের পানি মুছে দেবার সময় বলল, অনুশোচনার মারটাই বড় মার, তোমার গালে চড় মারব, কথাটা ভাবতে পারলে কি করে? ওসব কথা এখন থাক, যে বন্ধুর কাছে নিয়ে যাচ্ছি তার কথা বলছি শোন। সে প্রথম জীবনে বড় দুরন্ত ছিল। তারপর কেমন করে কি জানি তার পরিবর্তন হয়। ছেলেটা যেমন পড়াশুনায় ভাল তেমনি সব দিক দিয়ে জিনিয়াস। আমি তো ধর্মকর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না এবং মানতাম না। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার পর, ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি এবং যতটা পারি মেনে চলতে চেষ্টা করি। সে যদি কিছু জিজ্ঞেস করে খুব বুঝে-সুজে উত্তর দিয়ো।

রীমা বলল, তার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হল কি করে?

আমিও খুব দুরন্ত ছিলাম। ভার্সিটিতে পড়ার সময় পার্টি করতাম এবং একবার ইলেকসনের সময় অন্য পার্টির ছেলেরা আমাকে একা পেয়ে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছিল, সে সময় আমি বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করেছিলাম। তারপর তারা আমার মাথায় কি দিয়ে যেন আঘাত করে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। যখন জ্ঞান ফিরল দেখি আমি একটা ক্লিনিকে। আর আরিফ আমার পাশে। আরিফ খুব ধুরন্ধর ছেলে। সে কথা ভার্সিটির সব ছেলেমেয়েরা জানত। আমিও জানতাম। কিন্তু সে কোন পার্টি করত না। তাকে দেখে বুঝতে পারলাম, সেই আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেছে। তারপর থেকে আমি ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করি। আমাদের আর্থিক অবস্থার কথা জানতে পেরে অনেক সময় টাকা-পয়সা দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে। কয়েক দিন আগে দেশে যাবে বলেছিল। তার মায়ের অসুখ, ফিরেছে কিনা কে জানে।

রীমা আর কিছু না বলে চুপ করে রইল।

আরিফের বাসার কাছে এসে বেবি বিদায় করে আবসার গেটে নক করল। একটা পাড়াগাঁয়ের আটপৌরে শাড়ী পরা আধাবয়সী মেয়ে দরজা খুলে বলল, কাকে চান?

আবসার জানে এই বাসায় আরিফ একা থাকে। তাকে দেখাশোনা ও রান্না করে খাওয়াবার জন্য তাদের দেশের একজন বয়স্ক লোক থাকে। আরিফ তাকে ওমর চাচা বলে ডাকে। আজ একটা মেয়েকে দেখে বেশ অবাক হয়ে বলল, তুমি কে? ওমর চাচা নেই?

মেয়েটা বলল, সে বাজারে গেছে। আমি বেগম সাহেবের সঙ্গে এসেছি। আপনি কাকে চান? ওমরের বৌ আনোয়ারাকে সুফিয়া বেগম ও গোফরান সাহেব যখন ঢাকায় আসেন তখন সঙ্গে নিয়ে আসেন।

আবসার বলল, আমরা আরিফের কাছে এসেছি। সে কোথায়?

মেয়েটি বলল, ছোট সাহেব বেগম সাহেবের সঙ্গে কথা বলছেন। আপনারা ভিতরে এসে বসুন, ডেকে দিচ্ছি। কথা শেষ করে সে চলে গেল।

মেয়েটি চলে যাবার পর আবসার রীমাকে বলল, এস, বসা যাক। বসার পর বলল, মনে হয় ওর মা এসেছেন।

একটু পরে আরিফ এসে সালাম বিনিময় করে বলল, কিরে আবসার, কেমন আছিস? তারপর রীমার দিকে এক পলক চেয়ে নিয়ে আবার বলল, আমি যেতে পারিনি বলে ওকে সাথে করে নিয়ে এসে পড়েছিস, তাই না? ভালই করেছিস। আম্মা এসেছে, আব্বাও দু'একদিনের মধ্যে আসবে। আমি নাকি শুধু পড়াশুনা করি, খাওয়া-দাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখি না। তাই পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত আম্মা এখানে থাকবে। তা তোদের বাসার খবর সব ভাল?

আবসার বলল, আল্লাহ্ পাকের রহমতে ভাল। তোর আম্মার অসুখ বলেছিলি, এখন কেমন আছেন?

আরিফ বলল, অসুখ হয়েছিল, তবে আমি যাবার আগে ভাল হয়ে গেছে। বস, আম্মাকে ডেকে নিয়ে আসি। তোর কথা মাকে অনেক বলেছি।

আবসার বলল, মাকে পরে ডাকিস, তার আগে রীমার সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দিই।

আরিফ বলল, তার আর দরকার নেই। দেখেই বুঝতে পেরেছি। তারপর রীমার দিকে চেয়ে বলল, আপনার নাম রীমা জানতে পারলাম। আর আমার নাম যে আরিফ তা নিশ্চয় ওর কাছে শুনেছেন? এর পর আর পরিচয় হবার কি কিছু বাকি আছে? আপনারা দু'জন দু'জনকে পছন্দ করেন এবং খুব শিগ্‌গিরই বিয়ে করার কথাও হয়তো দু'জনে বলাবলি করেছেন।

আরিফের কথা শুনে রীমার তখন আবসারের কথা মনে পড়ল। ছেলেটার মধ্যে এমন একটা ক্ষমতা আছে, যার ফলে সে আগাম অনেক কিছু জানতে পারে। রীমা বলল, এত কিছু যখন বললেন তখন এর ফলাফলটা বললে খুব খুশি হতাম।

আরিফ হেসে উঠে বলল, সে খবর আল্লাহ পাক জানেন। মানুষ জানতে পারবে কেমন করে। তবে দোওয়া করি আল্লাহ আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুখের ও শান্তির করুক।

রীমা বলল, আমার কিন্তু বেশ ভয় ভয় করছে। আমার মত অসুন্দর মেয়েকে বিয়ে করে আপনার বন্ধু তার আত্মীয়স্বজনের কাছে হাস্যাস্পদ না হয়।

আরিফ আবার হেসে উঠে বলল, তা হয়তো প্রথম দিকে হতে পারে। তবে পরে যখন তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবে তখন বরং সকলে ওকে দেখে হিংসা করবে।

রীমা বেশ অবাক হয়ে বলল, আপনি এসব কথা জানতে পারলেন কেমন করে?

আরিফ হাসতে হাসতে বলল, সব অনুমান করে বললাম, তবে আমার অনুমান বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সত্য হয়। এখন এসব কথা থাক, আম্মাকে ডেকে নিয়ে আসি। তারপর সে ভিতরে চলে গেল।

একটু পরে আরিফ মাকে নিয়ে ফিরে এল।

আবসার সালাম দিয়ে এগিয়ে এসে কদমবুসি করে বলল, আমি আরিফের বন্ধু।

তার দেখাদেখি রীমাও ওঁনাকে কদমবুসি করতে এলে সুফিয়া বেগম তার হাত ধরে পাশে বসিয়ে বললেন, বেঁচে থাক মা, আল্লাহ তোমাদেরকে সুখী করুক। তোমাদের কথা আরিফের কাছে শুনেছি। এমন সময় ওমরের বৌ আনোয়ারা চা-নাস্তা নিয়ে এলে সুফিয়া বেগম বললেন, তোমরা নাস্তা খেয়ে গল্প কর, আমি আসছি। তারপর তিনি চলে গেলেন।

নাস্তা খাওয়ার পর আনোয়ারা কাপ প্লেট নিয়ে চলে যাবার পর আরিফ রীমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আপনাকে কয়েকটা কথা বলব, কথাগুলো শুনে কিছু মাইন্ড করতে পারেন, তাই অনুমতি চাচ্ছি।

রীমা বলল, আপনি নিশ্চিন্তে বলুন, আমি কিছু মাইন্ড করব না।

আরিফ বলল, আপনি নিশ্চয় নামাজ-কালাম পড়েন?

ঃ হ্যাঁ পড়ি।

ঃ কেন পড়েন বলুন তো?

রীমা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, এগুলো করার জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে মানুষকে হুকুম করেছেন।

আরিফ বলল, আপনি ঠিক কথা বলেছেন। কিন্তু আল্লাহ পাক কোরআনে পুরুষদের পোশাক সম্বন্ধে ডাইরেক্ট কিছু না বললেও মেয়েদের পোশাক সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন। যেমন— তাদেরকে বাইরে বেরোবার সময় আলাদা কাপড় দিয়ে সমস্ত শরীর ঢেকে বের হতে বলেছেন। যাতে করে মেয়েদের সৌন্দর্য যেন পুরুষের নজরে না পড়ে। আল্লাহ পাকের এই হুকুম কেন মেয়েরা মেনে চলে না বলতে পারেন? আপনি মেয়ে বলে জানার জন্য প্রশ্নটা করলাম। আপনাকে অপমান করার জন্য করিনি।

রীমা সালওয়ার কামিজ পরে বুকের উপর শুধু সরু একটা ওড়না ঝুলিয়ে রেখেছে।

আরিফের কথা শুনে লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে রইল। কোন কথা বলতে পারল না।

তাই দেখে আরিফ বলল, আমার কথা শুনে আপনি খুব লজ্জা পেয়েছেন মনে হচ্ছে। আপনাকে লজ্জা দেবার জন্য আমি কথাটা কিন্তু বলিনি। আমি শুধু জানতে চাই, মেয়েরা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক নামাজ পড়ে, কোরআন পড়ে, রোজা রাখে, অথচ যেভাবে তাদেরকে পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে বলা হয়েছে তা পরে না। এর কারণ আমি ভেবে পাই না। অথচ তাদের জানা উচিত ঐ সব পোশাক পরা যেমন শরীয়তে নিষিদ্ধ তেমনি ঐ রকম পোশাক পরে কোন ইবাদত করলেও তা কবুল হয় না। বিশেষ করে আজকাল মেয়েরা মাথায় কাপড় বা রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখতে চায় না। মাথার চুল পর পুরুষকে দেখানও শরীয়তে নিষেধ। এই কথাটা উচ্চ ফ্যামিলির মেয়েরা অনেকে জানে না। কিন্তু তাদের অনেকে এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির মেয়েরা জেনেও

মানে না। এর কারণ আপনি বলতে পারলেও লজ্জায় হয়তো বলতে পারছেন না। অথবা আপনার জানা নেই। তাই আমি যা মনে করি বলছি শুনুন, আজকাল অনেক মেয়ে মাথায় কাপড় দেওয়া বা রুমাল দিয়ে চুল ঢেকে রাখতে বা মুখমন্ডল ঢেকে রাখতে লজ্জা বোধ করে। তারা ভাবে— এটা করলে লোকে তাদেরকে আনকালচার্ড ভাববে। এগুলো অশিক্ষিত মেয়েদের ব্যাপার। অথবা তারা মাথা উন্মুক্ত রেখে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে চায়। আবার অনেকে ভাবে বিয়ের পর মেয়েদের মাথায় কাপড় দিতে হয়, কিন্তু আজকাল বিয়ের পরও মেয়েরা মাথায় তো কাপড় দেয় না বরং এমন পোশাকে বাইরে বেরোয়, তাতে করে তারা নিজেদেরকে কুমারী মেয়ে বলে পুরুষদের কাছে অবহিত হতে চায়। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে সরাসরি হারাম। শরীয়তে কুমারী বা বিবাহিতা সব বালেগ মেয়েদেরকে বাইরে বেরোবার সময় সারা শরীর ঢেকে নিতে আদেশ করেছে। আসলে শিক্ষিত শ্রেণীর বা উচ্চ ফ্যামিলির মেয়েরা বিধর্মীদেরকে বেশি অনুসরণ করে তাদের সভ্যতা গ্রহণ করছে। তাদের জানা উচিত, এটা ইসলামের দৃষ্টিতে সরাসরি নিষিদ্ধ। তাদের আর দোষ দেব কি। তাদের বাবা-মা বা স্বামীরা এর জন্য বেশি দায়ী। তারা হাদিসের আইন-কানুন না জেনে বিধর্মীদের সবকিছু দেখে ভাল মনে করে। নিজেদেরকে ও তাদের ছেলেমেয়েদেরকে সেই রকমভাবে গড়ে তুলছে। ফলে ইসলাম তাদেরকে কি পোশাক পরতে বলেছে তা তারা জানে না। এবং জানতেও চেষ্টা করে না। আসল কথা কি জানেন, এর ফলে তাদের দেখা-দেখি নিম্ন শ্রেণীর সমাজের মেয়েরাও তাদেরকে অনুসরণ করছে। যার ফলে সব শ্রেণীর মেয়েরা আজকাল তাদের দেহবল্লরী দেখিয়ে নিজেদের সৌন্দর্য জাহির করছে। এতে করে যে সমাজের অবক্ষয় হচ্ছে, সে দিকে কেউ লক্ষ্য করছে না। মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরাও বিদেশী সভ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। আর আমাদের মুসলমান সমাজের অবক্ষয়ের প্রধান কারণ হল, ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা। স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি এবং অফিস আদালতে যেভাবে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা চলছে এটা ইসলামে একেবারে নিষেধ। তাই বলে ইসলাম মেয়েদেরকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি করে রাখতে বলেনি। আল্লাহপাক তাদেরকে যে স্বাধীনতা দিয়েছে, তা জেনে যদি তারা সেইরকমভাবে স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি বা অফিস-আদালতে যাতায়াত করত, তা'হলে আমাদের সমাজের এত অবক্ষয় হত না। একটা জিনিস বোধ হয় সবাই বুঝতে পেরেছে, মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতার ফলে এবং তাদের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে তারা পুরুষ কর্তৃক বেশি ধর্ষিতা ও লাঞ্ছিতা হচ্ছে। আমরা অনেকে বলে থাকি— মেয়েদের শিক্ষিত করে তুললে এবং তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তুললে, তারা পুরুষ কর্তৃক এত ধর্ষিতা ও লাঞ্ছিতা হত না। কথাটা কিছুটা সত্য হলেও বাস্তবে তার নজীর খুব কম পাওয়া যায়। কারণ বহু শিক্ষিত ফ্যামিলিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুখ-শান্তি বলতে কিছুই নেই। অথচ তারা দু'জনেই উপার্জন করে। ইসলাম মেয়েদেরকে প্রয়োজনের তাগিদে উপার্জনের কথা বলেছে। বড় লোক হবার জন্য বা আয়েশ আরামে থাকার জন্য অথবা ভোগবিলাসে মত্ত থাকার জন্য অনুমতি দেয়নি। যে দেশে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক চাকরি না পেয়ে হতাশায় ভুগছে, ড্রাগ নিচ্ছে, মা-বোনের ভরণ-পোষণে ব্যর্থ হয়ে অকাজ-কুকাজ করছে, আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে, আর সে দেশে সচ্ছল পরিবারের মেয়েরা চাকরি করে ভোগবিলাসে মত্ত রয়েছে। কি করে তারা আরো ধনী হবে, সেই চেষ্টা করছে। আমার কথাগুলো হয়তো সবার কাছে ভাল লাগবে না। কিন্তু তাদেরকে একটু চিন্তা করে দেখার অনুরোধ করব এবং এ সম্বন্ধে কোরআন-হাদিসে কি আছে তা জানার জন্যও অনুরোধ করব। এক

মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। এটা কোরআনের কথা। আমি মুসলমান হয়ে যদি নিজে ভোগবিলাসের জন্যে, অন্য মুসলমানের ডালভাতের দিকেও লক্ষ্য না রাখি, তাহলে আমরা মুসলমান থাকতে পারি না। শুধু ঐ সব মেয়েদেরকে উপার্জনের অনুমতি ইসলাম দিয়েছে, যারা উপার্জন না করলে তাদের পরিবারের সবাই না খেয়ে থাকবে। অথবা ছেলেমেয়েদেরকে মানুষ করার জন্য অথবা মান-সম্মান বজায় রেখে বেঁচে থাকার জন্য। সেখানেও বিধি-নিষেধ দেওয়া হয়েছে, কিভাবে তারা উপার্জন করবে। যাই হোক এবার আপনাদের দু'জনকে আর একটা কথা বলে আমি ইতি টানব। জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনী পছন্দ করা খুব দুরূহ ব্যাপার। আপাতদৃষ্টিতে আমরা যা ভাল মনে করি, তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মন্দ হয়। তবে মেয়েরা যদি স্বামীকে তার প্রাপ্য সম্মান দেয়, তাহলে তাদের দাম্পত্য জীবন খুব সুখের হয়। অবশ্য স্বামীকেও তার স্ত্রীর প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে। কারণ একজনের দ্বারা কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। হাদিসে আছে, স্বামী স্ত্রীর অর্ধেক আর স্ত্রী স্বামীর অর্ধেক। দু'জনে মিলে পূর্ণ এক হয়। হাদিসে আরো আছে, স্বামীর প্রতি যতটা স্ত্রীর হক আছে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীরও ততটা হক আছে। আজকাল স্বামী স্ত্রী সে সব হকের কথা জানে না বলে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি থেকে তারা উভয়ে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সংসার জীবন অশান্তিময় হয়ে উঠছে। কেউ কারো কথা মেনে চলতে চাচ্ছে না। এটা হওয়ার একমাত্র কারণ ধর্মীয় জ্ঞানের ও তার অনুশীলনের অভাব এবং দূষিত পরিবেশের ফলাফল। আপনারা দু'জন সংসার জীবনে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একে অপরের ছোটখাট দোষত্রুটিগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। এবং কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে দু'জনে রাগারাগি না করে মিলেমিশে তার সমাধান করার চেষ্টা করবেন। যদি তা পারেন, তাহলে দেখবেন আপনাদের দাম্পত্য জীবন কত শান্তির হবে। আমি আর বেশি কিছু বলব না, আমার কথা শুনে বিরক্ত হলে ক্ষমা করবেন।

আবসার বলল, তোর কথাগুলো খুব দামী, তবে তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুই যেন কতকাল দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছিস। এসব জ্ঞান তুই কোথায় পেলি বলবি?

আরিফ বলল, তোর মাথায় ঘিলু বলতে কিছু নেই, সমাজের দিকে একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে অনেক কিছু জানা যায়। অবশ্য সেই সঙ্গে কোরআন-হাদিসের ব্যাখ্যাও পড়তে হবে। তোরা তো শুধু দুনিয়াদারীর জ্ঞান অর্জন করে মনে করেছিস, শিক্ষিত হয়ে গেছিস। সেই সঙ্গে যদি ধর্মীয় বই পুস্তক পড়তিস, তাহলে ঐ কথা বলতিস না।

রীমা বলল, আচ্ছা আরিফ ভাই, আপনি তো আগাম অনেক কিছু বলতে পারেন, আমরা ভবিষ্যতে সুখী হব কিনা একটু বলবেন?

আরিফ একটু রেগে গিয়ে আবসারকে বলল, তুই নিশ্চয় ওকে এই কথা বলেছিস? তোকে কতবার বলেছি না, একথা বলা হারাম। আল্লাহ পাক ছাড়া ভবিষ্যতের কথা কেউ জানে না, আর কেউ যদি বলে থাকে, তবে সে কথা বিশ্বাস করলে ঈমান থাকবে না। তারপর রীমাকে বলল, এরকম কথা আর কাউকে জিজ্ঞেস করবেন না। কারণ জিজ্ঞেস করাও কঠিন গোনাহ্।

রীমা বলল, তাহলে অনেকে যে হাত দেখে অনেক কিছু বলতে পারে আর সেগুলোর অনেক সত্যও হয়।

আরিফ বলল, হাত দেখা বিদ্যা আছে। তা সব সত্য না হলেও কিছু কিছু সত্য হয়। তবে ইসলামে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদিসে আছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "যে হাত দেখে এবং যে হাত দেখায় তাদের দু'জনের উপর আল্লাহর

লানত।" হাদিসে আরো আছে, "রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেনঃ ভবিষ্যৎ বক্তাগণের নিকট যে ব্যক্তি কিছু জানার জন্য জিজ্ঞাসা করে, তার ৪০ দিনের নামাজ কবুল হয় না।" *শুধু যেকোন বিদ্যা কেন, এমন কোন কথা বা কাজ যা মানুষের কাছে ভাল মনে হলেও যদি ইসলামে সে সব নিষেধ থাকে, তাহলে সেসব বলা বা করা হারাম, এটা হাদিসের কথা। আল্লাহপাক কোরআন পাকে বলেছেন, "গায়েবের কথা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না।" আমরা মুসলমান হিসেবে মানুষের কথা যত ভাল হোক না কেন তা বিশ্বাস না করে আল্লাহপাকের কথা বিশ্বাস করব। নচেৎ মুসলমান থেকে বাদ হয়ে যাব। তবে যারা আল্লাহপাকের খাসবান্দা তাদেরকে আল্লাহপাক ইলহামের দ্বারা অথবা এমন কিছু এলেম দান করেন, যার দ্বারা ভবিষ্যতের অনেক কিছু জানতে পারেন। সেরকম নেক বান্দা দুনিয়াতে খুব কম আছেন। তাঁরা মানুষকে সাবধান করার জন্য সে সবের কিছু কিছু বলে থাকেন। আর আমার কথা যা শুনেছেন, তা আমি অনুমান করে বলি। তার মধ্যে হয়তো দু'একটা ঠিক হয়ে যায়। এরকম অনেকে বলতে পারে। সেই অনুমানের উপর নির্ভর করে বলতে পারি— আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবন একরকম সুখের হবে। তবে সে জন্য আপনাদের দু'জনকে অনেক সহ্য-সময় করে চলতে হবে। এবার এসব কথা থাক। তারপর আবসারকে বলল, কিরে তোদের বিয়ে তাহলে কবে হচ্ছে?

আবসার বলল, আমি তো তাড়াতাড়ি আশা করছি। ভাবছি দু'একদিনের মধ্যে আব্বা-আম্মাকে বলব।

আরিফ বলল, তাই বল!

এমন সময় সুফিয়া বেগম এসে বললেন, তোমরা গল্প কর। দুপুরে খাবার খেয়ে যাবে।

আবসার বলল, এখানে এসেছি আমাদের বাড়ীর কেউ জানে না, সবাই চিন্তা করবে। পরে আর একদিন এসে খাব। এখন আমরা আসি। তারপর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল।

ফেরার পথে আবসার রীমাকে বলল, ওদেরকে কেমন মনে হল?

রীমা বলল, আরিফ ভাই খুব ধার্মিক ও একটা অর্ডিনারী ছেলে। আর ওঁর আম্মাও খুব ভাল মানুষ। আমার কি মনে হয় জান, আরিফ ভাইয়ের মধ্যে এমন কিছু জিনিস আছে, যা সাধারণ কোন ছেলের মধ্যে নেই।

আবসার বলল, সে কথা তো আমি আগেই তোমাকে বলেছি।

রীমা বলল, তুমি বিয়ের ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি করছ কেন?

ঃ কেন, তোমার কি কোন আপত্তি আছে?

ঃ না আপত্তি নেই তবে একটু চিন্তার বিষয় আছে।

ঃ যেমন?

ঃ তোমাকে তো বলেছি, আমার উপার্জনে সংসার চলছে। আমার বিয়ে হয়ে গেলে আব্বার সংসার চালাতে খুব অসুবিধে হবে।

ঃ সে ভাবনা তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি কি এমনই অমানুষ যে, সে বিষয়ে চিন্তা করব না? তা ছাড়া আল্লাহপাক একটা না একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেবেন।

রীমা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তোমার কথা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা, বিয়ের পর তুমি কি আমাকে চাকরি করার অনুমতি দিবে?

* বর্ণনায়ঃ হজরত হাফসা (রাঃ) -মোসলেম।

আবসার বলল, না দেব না। বললাম তো, তোমার বাবা-মার সংসারে যাতে অসুবিধে না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখব। ওসব নিয়ে তুমি চিন্তা করো না।

রীমা বলল, বেশ, তুমি যা ভাল বুঝবে করো। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

সেদিন বাড়ীতে এসে আবসার মাকে বলল, তোমরা তো আমার বিয়ে দিতে চাচ্ছো, তোমাদের যদি কোন মেয়ে দেখা না হয়ে থাকে, তাহলে আমি একটা মেয়ের ঠিকানা দিচ্ছি, সেখানে খোঁজখবর নিয়ে দেখতে পার।

আকলিমা বেগম আনন্দিত হয়ে বললেন, ঠিক আছে ঠিকানা দে, তোর আব্বার সঙ্গে আমিও দেখতে যাব।

আবসার ঠিকানা লিখে মায়ের হাতে দিয়ে বলল, মেয়েটা দেখতে তেমন ভাল নয়, তোমাদের পছন্দ নাও হতে পারে।

আকলিমা বেগম বেশ অবাক হয়ে বললেন, তাহলে আমাদেরকে দেখতে যেতে বললি কেন?

আবসার বলল, আচ্ছা মা, নানা কি খুব বোকা ছিলেন?

ঃ এ কথায় তাকে টানছিস কেন? বোকা না চালাক, সে কথা আমার চেয়ে তুই বেশি জানিস।

ঃ জানি বলেই তো মাথায় ঢুকছে না। যিনি সব দিকে জুয়েল, তার মেয়ে এত বোকা হলো কি করে?

আকলিমা বেগম ব্যাপারটি বুঝতে পেরে হেসে উঠে বললেন, আমি বোকা মেয়ে তো কি হয়েছে, আমার পেটের ছেলে তো তার নানার মত জুয়েল হয়েছে।

আবসার মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, দেখতে ভাল না হলেও মেয়েটার অনেক গুণ আছে।

আকলিমা বেগম বললেন, মেয়েদের শুধু রূপ থাকলেই সংসারে শান্তি আসে না, সেই সঙ্গে গুণও থাকতে হয়। দুনিয়াতে রূপ ও গুণ দু'টোই আছে, এমন মেয়ে খুব কম হয়। যাক তুই বলে ভালই করলি, তোর বাবার অপছন্দ হলে তাকে তোর কথা বলব।

ঃ বাবা যদি আমাকে অন্যরকম ভাবে?

ঃ না রে না, তুই কি আমাদের সে রকম ছেলে? তোর প্রতি তোর বাবার অগাধ বিশ্বাস। ও নিয়ে তুই ভাবিস না, তোর যখন পছন্দ তখন আমাদের অপছন্দ হবার কথাই উঠে না। আমি কিন্তু দু'এক মাসের মধ্যে বৌ ঘরে আনার কথা তোর বাবাকে বলব। তাতে তোর কোন আপত্তি নেই তো?

আবসার লজ্জা পেয়ে মাকে ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে যেতে বলল, তোমরা যা ভাল বুঝ কর, আমার আপত্তি নেই।

আকলিমা বেগম সেই দিনই ঠিকানাটা স্বামীর হাতে দিয়ে ছেলের কথা বললেন।

খায়ের সাহেব শুনে বললেন, আমি তোমার শরীরের কথা ভেবে ওর জন্য মেয়ের খোঁজ করছিলাম। যাক, ও যখন নিজেই পছন্দ করেছে তখন আর দেরি করব না। দু'এক মাসের মধ্যে ব্যবস্থা করব।

আকলিমা বেগম বললেন, আমারও ইচ্ছা তাই।

পরের দিন আবসার অফিসে যাবার পথে রীমার সঙ্গে দেখা হতে সালাম বিনিময় করে বলল, আজ অফিস ছুটির পর এখানে অপেক্ষা করবে কিছু কথা আছে।

রীমা বলল, এখন বললে হয় না?

ঃ হয়, তবে বলব না। কারণ কথাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া বেশ সময় লাগবে।

ঃ ঠিক আছে, তাই হবে।

আবসার বাস আসতে দেখে বলল, এখন তাহলে আসি? ঠিক সাড়ে চারটের সময় আসব। ভুলে যেয়ো না যেন। তারপর সালাম বিনিময় করে বাসে উঠল।

রীমার ছুটি সাড়ে চারটেয়। অফিস থেকে বেরিয়ে বাস স্ট্যান্ডের কাছে এসে আবসারকে দেখতে পেল না। ভাবল, কোন কারণে হয়তো দেরি হচ্ছে। আধঘন্টা পার হয়ে যাবার পরও যখন আবসার এল না তখন ভাবল, অফিসের কাজে হয়তো আটকে পড়েছে, আজ আর আসতে পারবে না। তবু আরো দশ মিনিট অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। কারো জন্য অপেক্ষা করা যে কত কঠিন, তা অনেকে জানেন; কিন্তু একজন যুবতী মেয়ের পক্ষে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা যে আরো বেশি কঠিন, তা ভুক্ত ভোগীরা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তাও আবার অফিস ছুটির সময়। সবাই যেন তাকে গিলে খেয়ে ফেলতে চায়। আরিফ যেদিন মেয়েদের পোশাক সম্বন্ধে আলোচনা করেছিল, সেদিন থেকে রীমা একটা বড় ওড়না দিয়ে শরীর ঢেকে রাখে এবং মাথার চুল রুমাল দিয়ে বেঁধে রাখে। তবু পথিকদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে রেহাই পাচ্ছে না। দু'তিনটে যুবক পাশ থেকে যাবার সময় একজন সাথীদের বলল, মেয়েটা বোধ হয় কলগার্ল। চান্স নিয়ে দেখব নাকি? এই কথায় হেসে উঠে তাদের একজন বলল, সাহস থাকলে চেষ্টা করে দেখ। তবে মনে রাখিস, যদি তোর অনুমান মিথ্যে হয়, তাহলে মেয়েটা পায়ের জুতো দিয়ে তোর মুখ পালিশ করে দেবে। দেখছিস না, মেয়েটার গায়ে মাথায় ওড়না রয়েছে! তাদের কথা শুনে রীমার ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলে গেল। ভাবল, দ্বিতীয় যুবকটার কথাই ঠিক। কেউ ঐরকম বলতে এলে, সত্যি সত্যি পায়ের জুতো খুলে তার মুখ পালিশ করে দিতাম। এমন সময় আবসারকে বাস থেকে নামতে দেখে রাগ করে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রইল।

আবসার কাছে এসে সালাম দিয়ে বলল, আমি খুব দুঃখিত। বড় সাহেব মিটিং কল করেছিলেন। অনেক কষ্টে ম্যানেজ করে বেরিয়ে এসেছি। তাই দেরি হয়ে গেল।

তার কথা শুনে রীমার রাগ পড়ে গেল। তবু মুখ ভার করে সালামের উত্তর দিয়ে বলল, এদিকে অপেক্ষা করতে করতে যেমন পা ব্যথা হয়ে গেছে, তেমনি লোকজন আমাকে গিলে ফেলতে চাচ্ছে।

আবসার বলল, অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইছি।

রীমা বলল, অনিচ্ছাকৃত যখন, তখন আর কি করা যাবে। তবে ইচ্ছাকৃত হলে করতাম না।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হ্যাঁ তাই।

ঃ ঠিক আছে, চল ঐ সামনের হোটেলে গিয়ে বসা যাক, নাস্তা খেতে খেতে আলাপ করা যাবে।

হোটেলে এসে নাস্তা খাবার সময় রীমা বলল, এবার বল, কি তোমার গুরুত্বপূর্ণ কথা,

ঃ জানতে খুব ইচ্ছা করছে বুঝি?

ঃ গুরুত্বপূর্ণ কথা জানতে তো ইচ্ছা হবেই।

ঃ কথাটা গুরুত্বপূর্ণ হলেও আসলে সুখবর।

ঃ যাই হোক না কেন, তুমি বল।

ঃ বলব তো বটেই; কিন্তু সুখবর শুনে কি উপহার দেবে বল?

ঃ আগে শুনি, তারপর উপহার দেবার কথা চিন্তা করব।

ঃ গতকাল মাকে তোমার কথা বলেছি। কয়েক দিনের মধ্যে হয়তো মা-বাবা তোমাদের বাসায় যাবে।

রীমা কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, আমার যেন কেমন ভয় ভয় করছে। ওঁরা যদি আমাকে দেখে অপছন্দ করেন?

তোমাকে সেদিনও বলেছি আবার আজও বলছি, তারা তোমাকে অপছন্দ করলেও বিয়েতে অমত করবে না। মা আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছে। তার অমতের প্রশ্নই উঠে না। বাবা অমত করতে পারে। মা তাকে ম্যানেজ করবে বলেছে। ওসব নিয়ে চিন্তা করার কোন কারণ নেই। এত বড় সুখবর দিলাম, কিছু প্রেজেন্ট করবে না?

রীমা ভিজে গলায় বলল, করতে তো মন চাইছে; কিন্তু দেবার মত এখন আমার কিছুই নেই। আল্লাহ যদি সে দিন দেন, তাহলে... বলে থেমে গেল।

ঃ কি হল থেমে গেলে কেন? তাহলে কি? ২৭

ঃ সময় হলে জানতে পারবে।

ঃ আমি কিন্তু তোমার কাছে শুধু একটা জিনিস পেতে চাই। সেটা ছাড়া অন্য কোন কিছুতে আমি খুশি হব না।

ঃ বল সেটা কি? নিশ্চয় তা দেব।

ঃ ভালবাসা। লোকে ভালবাসা করে বিয়ে করে। বিয়ের কিছুদিন পর সংসারের যাঁতাকলে সেই ভালবাসা নিষ্পেষিত হয়ে মরে যায়। আমরা বিয়ের পর দু'জন দু'জনকে এমন ভালবাসব, যা সংসারের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েও মরে যাবে না, বরং সেই ভালবাসা আরো গভীর থেকে গভীরতর হবে।

রীমা আবসারের মুখে অকল্পনীয় ভালবাসার কথা শুনে খুব অবাক হয়ে ভিজে গলায় বলল, আল্লাহপাক আমার ভাগ্যে কি এত সুখ রেখেছেন? আমি যে চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছি।

ঃ ভাগ্যের কথা আল্লাহপাক জানেন। তোমার কাছে যা চাইলাম, তা যদি তুমি দিতে পার, তাহলে মনে করব, আমার থেকে সারা পৃথিবীতে আর কেউ সৌভাগ্যবান নেই।

রীমা চোখ মুছে ভিজে গলায় বলল, আল্লাহপাক আমাকে যতটুকু ভালবাসার জ্ঞান দিয়েছেন, তা সব উজাড় করে তোমাকে দেব। জানি না তাতে তুমি খুশি হবে কিনা।

আবসার আলহামদুলিল্লাহ বলে বলল, ব্যাস, তোমার মুখ থেকে যা শুনতে চেয়েছিলাম, আল্লাহপাক তাই শোনালেন। নাস্তা খাওয়া আগেই শেষ হয়েছিল, বলল, চল এবার উঠা যাক।

রীমা বলল, হ্যাঁ তাই চল।

আবসার রীমাদের বাসা পর্যন্ত একসঙ্গে এল, তারপর সালাম বিনিময় করে নিজেদের বাসার দিকে রওয়ানা দিল।

কয়েক দিন পর আবসার যখন অফিসে যাওয়ার আগে নাস্তা খাচ্ছিল তখন আকলিমা বেগম তাকে বললেন, তুই যে মেয়েটার কথা বলেছিলি, তার কথা তোর বাবাকে বলেছিলাম। কাল অফিস বন্ধ। আমি ও তোর বাবা মেয়েটাকে দেখতে যাব। তুই ওদের বাসায় খবরটা দিস।

আবসার বলল, ঠিক আছে দেব।

অফিসে যাবার পথে রীমাকে বলল, কাল মা ও বাবা তোমাকে দেখতে আসবে। খবরটা তোমার মা-বাবাকে জানিয়ে দিয়ো।

রীমা বলল, কিন্তু নিজের বিয়ের সম্বন্ধের কথা মা-বাবাকে বলব কি করে?

ঃ তাহলে আমি না হয় তাদেরকে বলব, আপনাদের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ করার জন্য বাবা-মা আসবেন।

রীমা হেসে ফেলে বলল, ইয়ার্কি রাখ। কিভাবে জানাব একটা বুদ্ধি বের কর।

আবসার বলল, তুমি শিক্ষিত ও চাকরিজীবী মেয়ে, বুদ্ধি করে কিছু একটা বলো।

ঃ তা ছাড়া আর উপায় কি! তোমার বুদ্ধিতে যখন কুলাচ্ছে না তখন আমাকেই ম্যানেজ করতে হবে। এখন তাড়াতাড়ি চল, নচেৎ লেট লতিফের খাতায় নাম উঠবে।

সেদিন অফিস থেকে বাসায় ফিরে রীমা মাকে বলল, একটা ছেলের সঙ্গে বেশ কিছুদিন আগে থেকে আলাপ-পরিচয় আছে। কাল সকালের দিকে তার মা-বাবা আমাকে দেখতে আসবেন। তুমি বাবাকে বলো।

মেয়ের কথা শুনে ফজিলা খাতুন অবাক হলেও মনে মনে খুশি হলেন। বললেন, ছেলেটার খোঁজখবর ভাল করে নিয়েছিস?

রীমা কথাটা বলে লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে ছিল। সেই অবস্থাতেই বলল, আমি যতটুকু নেবার নিয়েছি, এবার তোমরা নিবে।

ফজিলা খাতুন বললেন, ঠিক আছে, তুই এখন কাপড় পাল্টে হাত-মুখ দুয়ে নাস্তা খেয়ে নে। তারপর স্বামীকে কথাটা জানালেন।

স্ত্রীর কথা শুনে আব্দুর রহমানও কম অবাক হলেন না। বললেন, আল্লাহপাকের যা মর্জি তাই হবে। ওঁরা আগে আসুক তারপর অবস্থা বুঝে কথাবার্তা বলা যাবে।

পরের দিন খায়ের সাহেব ও আকলিমা বেগম রীমাদের বাসায় এলেন।

আব্দুর রহমান ও ফজিলা খাতুন সাধ্যমত খাতির-যত্ন করলেন। রীমাই তাদেরকে খাওয়া-দাওয়া করালো। তাকে দেখে দু'জনের কারো পছন্দ হল না। তাছাড়া এদের সামাজিক স্ট্যাটাস অনেক নিম্ন শ্রেণীর মনে হল। সে কথা খায়ের সাহেব এক ফাঁকে স্ত্রীকে বললেন।

আকলিমা বেগম স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, আমিও তা বুঝেছি। কিন্তু আবসার এই মেয়েকেই বিয়ে করতে চায়। আমার কি মনে হয় জান, ওরা আজকালের ছেলে-মেয়ে তো, হয়তো দু'জন দু'জনকে ভালবাসে।

খায়ের সাহেব বললেন, তাই বলে আমাদের সমাজের বাইরের একটা অসুন্দর মেয়েকে আমরা বৌ করতে পারি না!

ঃ তোমার কথা ঠিক; তবে আমি ভাবছি, আমরা অমত করলে আবসার অন্য মেয়েকে এখন বিয়ে করতে চাইবে না। শেষে হয়তো ওরা কাজী অফিসে নিজেরা বিয়ে করে ফেলবে।

ঃ আবসার সেরকম কিছু তোমাকে বলেছে নাকি?

ঃ অতটা বলেনি; তবে যেটুকু বলেছে তাতেই আমার এই রকম মনে হয়েছে। এমন সময় আব্দুর রহমানকে আসতে দেখে তারা চুপ করে গেল।

খায়ের সাহেব ও আকলিমা বেগম পরে সবকিছু জানাবেন বলে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। বিদায় মুহূর্তে রীমা তাদেরকে কদমবুসি করতে ওঁরা আড়াইশো করে পাঁচশো টাকা তার হাতে দিয়ে বললেন, বেঁচে থাক মা, সুখী হও।

বাসায় ফিরে এসে খায়ের সাহেব ছেলেকে ডেকে বললেন, তুমি বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ, ভালমন্দ বুঝার জ্ঞানও হয়েছে; কিন্তু আমি খুব অবাক হচ্ছি, গার্মেন্টিসে চাকরি করা নিম্ন সমাজের একটা অসুন্দর মেয়েকে তুমি পছন্দ করলে কি করে? তোমার কাছ থেকে এটা আমরা আশা করিনি।

আবসার জানে রীমাকে বাবা-মা পছন্দ করবে না। তাই কোন কথা না বলে চুপ করে রইল।

খায়ের সাহেব রাগের সঙ্গে বললেন, কিছু বলছ না কেন?

ঃ আমার যা কিছু বলার আগেই মাকে বলেছি।

ঃ তার মানে, ঐ মেয়েকেই তুমি বিয়ে করতে চাও?

ঃ হ্যাঁ বাবা।

খায়ের সাহেব আরো বেশি রেগে গিয়ে বললেন, আমরা যদি ঐ মেয়েকে ঘরে না তুলি?

আবসার ধীর-স্থির স্বরে বলল, বাবা তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? রীমা দেখতে হয়তো সুন্দর নয়; কিন্তু তাকে আমি পছন্দ করি এবং ভালবাসি। আমি আমার জ্ঞানের অনুভূতিতে বুঝতে পেরেছি, ওকে পেলে সুখী হব। সুন্দরের মধ্যে অনেক অসুন্দর লুকিয়ে থাকে। আবার অসুন্দরের মধ্যেও সুন্দর লুকিয়ে থাকে। আমি রীমার মধ্যে এমন অনেক সুন্দরের প্রমাণ পেয়েছি, যা অনেক সুন্দরী মেয়ের মধ্যে নেই। আর তুমি যে নিম্ন সমাজের কথা বলছ, সেটা ঠিক হলেও আমরা তো ঐ সমাজে মেয়ে দিচ্ছি না যে, আমাদের মেয়ে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না। সারগাদায় অনেক সময় গোলাপ ফুল ফুটে। মানুষ ঐ নোংরা জায়গায় সব সময় যাতায়াত না করলেও ফুল তুলতে যায়। আমরা না হয় রীমাকে নিয়ে এসে ঐ সমাজে যাতায়াত করব না।

খায়ের সাহেব ছেলের কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, তুমি এখন যাও।

আবসার মাথা নিচু করে চলে এল।

সেখানে আকলিমা বেগমও ছিলেন। ছেলে চলে যাবার পর বললেন, আমি তোমাকে আগেই বলেছি না, আবসার ঐ মেয়েকেই বিয়ে করবে!

ঃ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি ছেলের পক্ষে!

ঃ পক্ষে ঠিক নয়, তবে তুমি যা কিছু বল না কেন, আবসারের কথাগুলো অনেকটা সত্য। মেয়েটার মুখের শ্রী খারাপ হলেও দেহের গড়ন ভাল। মেয়ের মায়ের মুখে শুনলাম, মেয়েটা খুব কর্মঠ। আমাদের সংসারে ঐ রকম মেয়েই দরকার। সুন্দরী মেয়েদের দেমাগ বেশি। তাছাড়া আবসার যখন তাকে পছন্দ করে ভালবেসেছে তখন আমাদের অমত করা কি ঠিক হবে?

খায়ের সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, চিন্তা করে দেখি কি করা যায়।

পরের দিন অফিসে যাবার পথে আবসার রীমার সঙ্গে সালাম বিনিময় করে বলল, মা-বাবাকে কেমন দেখলে?

রীমা ম্লানমুখে বলল, ভাল।

ঃ আমাদের বিয়ের ব্যাপারে কোন কথাবার্তা বলতে শুনেছ নাকি?

ঃ না। তবে ওঁরা পরে জানাবেন, শুধু এতটুকু শুনেছি।

আবসার রীমার ম্লান মুখ দেখে বুঝতে পারল, সে অনিশ্চয়তায় ভুগছে। পথ আগলে তার মুখের দিকে চেয়ে বলল, আমার চোখের দিকে চেয়ে দেখ তো, কিছু বুঝতে পার কিনা?

রীমা কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে বুঝতে পারল, সেখানে আশ্বাসের ইশারা রয়েছে। দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল, কিন্তু.....।

আবসার তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল, কোন কিন্তু নয়, আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে এতটুকু নড়ব না। তোমার কাছে একান্ত অনুরোধ, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো না।

রীমা ভিজে গলায় বলল, ঠিক আছে তাই হবে। এবার চল, নচেৎ রোজ রোজ লেট লতিফ হলে দু'জনেরই চাকরি থাকবে কিনা সন্দেহ।

আবসার বলল, তুমি ঠিক কথাই বলেছ।

এক ছুটির দিন আবসার আরিফের সঙ্গে দেখা করে বলল, রীমার ব্যাপারে মা রাজি থাকলেও বাবা রাজি নয়। তুই যদি বাবাকে বলিস, তাহলে নিশ্চয় রাজি হবে।

আরিফ হেসে উঠে বলল, চিন্তা করিস না এ বিয়ে তোদের হবেই।

ঃ তবু তুই বাবার সঙ্গে দেখা কর।

ঃ ঠিক আছে চল, এক্ষুনি তোর সঙ্গে যাই।

বাসার কাছে এসে আবসার বলল, তুই গিয়ে বাবার সঙ্গে আলাপ কর, আমি বাইরে তোর জন্য অপেক্ষা করছি।

আরিফ ওদের বাসায় ঘরের ছেলের মত যাতায়াত করে। বাসায় ঢুকে খায়ের সাহেবকে দেখতে পেয়ে সালাম দিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করল।

খায়ের সাহেব সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, ভাল আছি বাবা। এস, বস। তা তুমি ভাল আছ তো? অনেক দিন আসনি কেন?

ঃ জ্বী ভাল আছি। একটা কাজে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম, পরীক্ষা নিয়েও বেশ ঝামেলা চলছে, তাই আসতে পারিনি। আজ আমি আপনার সঙ্গে কিছু আলাপ করতে এসেছি।

ঃ বেশ তো বল, কি আলাপ করতে চাও। তারপর একটু জোরে ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে বললেন, এই কে আছিস, আরিফ এসেছে, কিছু নাস্তা নিয়ে আয়।

ঃ আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি বলছিলাম, আবসার যে মেয়েকে পছন্দ করেছে তাকে আমি দেখেছি। তার সঙ্গে আলাপও করেছি। মেয়েটা দেখতে খারাপ হলেও তার অনেক গুণ আছে। আমি তাকে যতটুকু জেনেছি, তাতে করে বলতে পারি, মেয়েটা আপনাদের সবাইকে ইন্‌শাআল্লাহ সুখী করতে পারবে।

খায়ের সাহেব আরিফকে খুব স্নেহ করেন। ভার্সিটিতে পড়ার সময় যে আরিফ আবসারকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছে। যার সংস্পর্শে এসে আবসারের চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে এবং ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, সেই আরিফ যখন ভাল হবে বলছে তখন আর না করতে পারলেন না। বললেন, তুমি যখন বলছ তখন আর অমত করব না।

আরিফ মনে মনে আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করল। এমন সময় আকলিমা বেগমকে নাস্তা নিয়ে আসতে দেখে সালাম দিয়ে বলল, আপনি আবার এসব আনতে গেলেন কেন? আমি তো নাস্তা খেয়ে এসেছি।

আকলিমা বেগম বললেন, তাতে কি হয়েছে? ছেলে মায়ের কাছে এলে, মা কি কিছু না খাইয়ে ছাড়ে।

আরিফ নাস্তা খেতে শুরু করলে খায়ের সাহেব স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আবসার যে মেয়েকে পছন্দ করেছে, তাকে আরিফেরও পছন্দ।

আকলিমা বেগম বললেন, তাহলে তুমি তো আর অমত করতে পারবে না।

আরিফ নাস্তা খেয়ে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসে আবসারকে দেখে বলল, দু'রাকাত শোকরানার নামাজ পড়িস। কেল্লা ফতে করে এলাম।

আবসার শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলে বলল, নিশ্চয় পড়ব।

আরিফ বলল, পুরস্কার পাওনা রইল, এখন চলি। তারপর সালাম বিনিময় করে চলে গেল।

ঐদিন রাতে খায়ের সাহেব আবসারকে বললেন, আরিফ সকালে এসেছিল। সে ঐ মেয়েটিকে চিনে এবং তার সম্বন্ধে কিছু ভাল কমেন্ট করেছে, তাই আমি এই কাজ করব। তবু তোমাকে কয়েকটা কথা বলছি মন দিয়ে শোন, "মেয়ের বাবার আর্থিক অবস্থা তুমি নিশ্চয় জান। বিয়েতে মেয়ে জামাইকে যে কিছুই দিতে পারবেন না, তাও নিশ্চয় জান। কোন দিন সে ব্যাপারে বৌমাকে কোন খোঁচা দিতে পারবে না। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কোন দিন শ্বশুরবাড়ি যেতে পারবে না। আমরা বৌমাকে কোন দিন তার বাবা-মার কাছে পাঠাব না। তুমি মাঝে-মধ্যে বৌমাকে সঙ্গে করে তার বাবা-মাকে দেখিয়ে আনতে পারবে। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হবার পর বৌমা আর চাকরি করবে না," এই সব তুমি যদি মেনে নাও, তাহলে আমরা তোমার কথায় রাজি হতে পারি।

আবসার বলল, তাই হবে বাবা।

তারপর মাসখানেকের মধ্যে খায়ের সাহেব রীমাকে পুত্রবধূ করে ঘরে নিয়ে এলেন।

রীমা গার্মেন্টিসে চাকরি করলেও কাটিং শিখেছিল। স্বামীর ঘরে এসে কিছু দিনের মধ্যে সবার মন জয় করে নিল। তারপর স্বামী ও শ্বশুরের সহায়তায় বাসাতেই মেয়েদের সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলে ভাল টাকা রোজগার করতে লাগল। বছর খানেকের মধ্যে সংসারে উন্নতি দেখে শ্বশুর-শাশুড়ীর খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। রীমা যে শুধু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নিয়ে ব্যস্ত থাকত তা নয়, সেই সঙ্গে সংসারের সব কাজ ও শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা-যত্নের দিকে খুব লক্ষ্য রাখত। অবশ্য সংসারে অন্যান্য কাজের জন্য একজন মেয়ে রেখেছে। যে সব আত্মীয়-স্বজনেরা বৌ দেখে ছিঃ ছিঃ করেছিল, বৌ-এর গুণের পরিচয় পেয়ে এখন তারা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রীমা স্বামীর সংসারে এত ব্যস্ত থাকলেও নিজের মা-বাবার কথা ভুলেনি। স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে তাদেরকে মাসিক বেশ কিছু টাকা সাহায্য করছে।

bdeboi.com

তিন

আজ রীমাও স্বামী-শাশুড়ীর সঙ্গে শ্বশুরকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছে। আর আরিফ আবসারের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাদের বাসায় গিয়েছিল, সেও তাদের সঙ্গে এসেছে।

আবসার বাসায় চলে যাবার পর আরিফের পাশে একটা দাড়ি-টুপিওয়ালা ছেলে এসে বসল। আরিফ তাকে ঘন্টাখানেক আগে একজন রুগীকে নিয়ে হাসপাতালের ভিতর যেতে দেখেছিল। পাশে এসে বসার পর জিজ্ঞেস করল, আপনার রুগী কেমন আছে?

ছেলেটার নাম ফয়সাল। বলল, একই রকম।

এমন সময় একটা বেবী এসে গেটের কাছে থামতে সবার দৃষ্টি সেদিকে পড়ল। একজন বয়স্কা মেয়ে তাড়াতাড়ি বেবী থেকে নেমে হাসপাতালের ভিতরে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেল।

দারোয়ান জিজ্ঞেস করল, ভিতরে কেন যাবেন? জানেন না, রুগী দেখার সময় বিকেল চারটেয়।

মেয়েটি বলল, আমি রুগী দেখতে আসিনি। আমার সাহেবের মেয়ে পায়খানা বমি করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাকে নিয়ে এসেছি।

দারোয়ান বলল, সাহেবদের কেউ আসেনি?

মেয়েটি বলল, সাহেব গতকাল রাজশাহী গেছেন। তার আর কেউ নেই। দারোয়ান একবার বেবীর দিকে চেয়ে নিয়ে বলল, কারো সাহায্যে নিয়ে আসুন।

মেয়েটি নিরুপায় হয়ে যেখানে রুগীদের লোকজন বসে আছে, সেখানে এসে কাতরস্বরে বলল, আপনারা কেউ আমাকে সাহায্য করুন। আমার সাহেবের মেয়ে অজ্ঞান অবস্থায় বেবীতে রয়েছে।

সেখানে সব বয়সের অনেক মেয়ে-পুরুষ রয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে, যে মেয়েটি বেবীতে রয়েছে তার কলেরা হয়েছে। তাই কেউ কোন কথা না বলে একবার বেবীর দিকে আর একবার মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখতে লাগল।

কেউ সাহায্য করতে আসছে না দেখে মেয়েটি আরো বেশি কাতরস্বরে বলল, আপনারা কেউ আসছেন না কেন? আপনাদের কারো মা-বোনের কলেরা হলে কি চুপ করে থাকতে পারতেন?

আরিফ এতক্ষণ দেখছিল, কেউ সাহায্য করতে যায় কিনা। এবার সে দাঁড়িয়ে ফয়সালের দিকে চেয়ে বলল, আসুন আমরা মেয়েটিকে সাহায্য করি।

ফয়সাল আরিফের কথায় সাড়া না দিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল।

আরিফ যা বোঝার বুঝে গেল। মৃদু হেসে মেয়েটিকে বলল, চলুন আমি যাচ্ছি। তারপর বেবীর কাছে এসে রুগীকে দেখে মনে হোঁচট খেল। প্রথমে বয়স্কা মেয়েটিকে দেখে মনে করেছিল, কোন সাধারণ মধ্যবিত্ত সাহেবের বাড়ীতে কাজ করে। কিন্তু রুগীকে দেখে তার সে ভুল ভাঙল। এ যে কোটিপতির অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। রুগীর মুখের চেহারায় ও পোশাকে উঁচু আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। আরিফ অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল।

ততক্ষণে ঐ মেয়েটি বেবীর কাছে এসে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, আপনি একা কি পারবেন? আমি ধরছি বাবা।

আরিফ রুগীর রূপলাবণ্য দেখে বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। মেয়েটির কথায় বাস্তবে ফিরে এসে বলল, ইন্‌শাআল্লাহ পারব। তারপর রুগীকে পাঁজাকোলা করে হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারের সামনের স্ট্রেচারে শুইয়ে দিল।

ঠিক সেই সময় রীমা স্বামীকে কিছু বলবে বলে গেটের দিকে আসছিল। একটা মেয়েকে আরিফ পাঁজাকোলা করে নিয়ে এসে স্ট্রেচারে শোয়াতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

মেয়েটিকে শুইয়ে গিয়ে আরিফ যখন চলে যেতে উদ্যত হল তখন রীমার ডাক শুনতে পেল, আরিফ ভাই এদিকে একটু আসুন।

আরিফ রীমার কাছে গিয়ে বলল, খালুজান এখন কেমন আছেন?

ঃ জ্ঞান ফিরেছে; তবে এখনো খিচুনী অল্প অল্প হচ্ছে। ডাক্তার পাউরুটি ও কলা খাওয়াতে বললেন। আপনার বন্ধুকে কিনে আনতে বলুন।

ঃ তাকে আমি কিছুক্ষণ আগে বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছি। খেয়ে-দেয়ে আপনাদের ভাত নিয়ে আসবে।

রীমা একটা পঞ্চাশ টাকার নোট তার দিকে বাড়িয়ে বলল, তাহলে আপনি রুটি ও কলা নিয়ে আসুন। তার আগে বাইরের কলে হাত, পা ও মুখ ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

আরিফ টাকা না নিয়ে বলল, ওটা রেখে দিন, আমার কাছে আছে। তারপর রীমা কিছু বলার আগে সে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রায় পনের বিশ মিনিট পর রুটি-কলা কিনে এনে রীমার হাতে দিল।

রীমা বলল, আপনার বন্ধু তো কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বেন। আপনার এখানে থাকার দরকার নেই। এক্ষুনি আপনি বাসায় গিয়ে সাবান দিয়ে গোসল করে খাওয়া-দাওয়া করবেন। তারপর বিকেলের দিকে না হয় আসবেন। আর শুনুন, এই কাপড়-চোপড় বাসায় গিয়ে লন্ড্রিতে পাঠিয়ে দেবেন।

আরিফ বলল, আবসার না আসা পর্যন্ত যাব না। আমি হোটেল থেকে খেয়ে এসে বাইরে থাকব। দরকার হলে ডাকবেন।

রীমা আতঙ্কিত স্বরে মিনতি করল, না আরিফ ভাই না। আপনাকে থাকতে হবে না। আপনি একটা কলেরা রুগীকে দু'হাতে জড়িয়ে ভিতরে এনেছেন। একজন উচ্চশিক্ষিত ছেলে হয়ে এটা জানেন না, আপনার সর্ব প্রথম কর্তব্য হল, সাবান দিয়ে গোসল করে অন্য পোশাক পরা!

আরিফ মৃদু হেসে বলল, আপনার কথা অস্বীকার করছি না; তবে আপনি বোধ হয় জানেন না, সাবধানের যেমন মার নেই, তেমনি মারের সাবধান নেই।

রীমা বলল, দোহাই আপনার, কথা না বাড়িয়ে যা বললাম তাই করুন।

আরিফ বলল, আপনি তো মায়ের জাত, তাই সব কিছুতেই অমঙ্গল চিন্তা করেন।

রীমা অধৈর্য হয়ে বলল, আহ আরিফ ভাই, তর্ক না করে শিগ্‌গির বাসায় যান।

আরিফ দৃঢ়স্বরে বলল, আপনি ওগুলো নিয়ে ভিতরে যান। আবসার আসার পর আপনার আদেশ পালন করব।

রীমা জানে আরিফ ভাই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করে না, তাই তার কথা শুনে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল।

আরিফ আগের জায়গায় বসার জন্য আসবার সময় দেখল, ফয়সাল ফুটপাতে একটা গাছের ছায়ায় বসে আছে। তার কাছে এসে পাশে বসে বলল, তখন আপনি মেয়েটিকে সাহায্য করতে আমার সঙ্গে এলেন না কেন? কোন অসুখকেই ভয় করা উচিত নয়।

ফয়সাল বলল, আমাকে ভুল বুঝবেন না। অসুখকে ভয় করে নয়, মেয়েরুগী বলে যাইনি।

ঃ কেন? রুগী রুগীই। সে মেয়ে হোক অথবা পুরুষ হোক। বিপদের সময় মেয়ে-পুরুষ বিচার করা অজ্ঞতার পরিচয়।

ঃ বেগানা মেয়ের গায়ে হাত দেওয়া শক্ত গোনাহ।

আরিফ খুব অবাক হয়ে বলল, আপনি নিশ্চয় পড়াশুনা করছেন?

ঃ জ্বী, আলিয়া মাদ্রাসার ফাজেলের ছাত্র।

ঃ জ্ঞান ফিরেছে; তবে এখনো খিচুনী অল্প অল্প হচ্ছে। ডাক্তার পাউরুটি ও কলা খাওয়াতে বললেন। আপনার বন্ধুকে কিনে আনতে বলুন।

ঃ তাকে আমি কিছুক্ষণ আগে বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছি। খেয়ে-দেয়ে আপনাদের ভাত নিয়ে আসবে।

রীমা একটা পঞ্চাশ টাকার নোট তার দিকে বাড়িয়ে বলল, তাহলে আপনি রুটি ও কলা নিয়ে আসুন। তার আগে বাইরের কলে হাত, পা ও মুখ ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

আরিফ টাকা না নিয়ে বলল, ওটা রেখে দিন, আমার কাছে আছে। তারপর রীমা কিছু বলার আগে সে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রায় পনের বিশ মিনিট পর রুটি-কলা কিনে এনে রীমার হাতে দিল।

রীমা বলল, আপনার বন্ধু তো কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বেন। আপনার এখানে থাকার দরকার নেই। এক্ষুনি আপনি বাসায় গিয়ে সাবান দিয়ে গোসল করে খাওয়া-দাওয়া করবেন। তারপর বিকেলের দিকে না হয় আসবেন। আর শুনুন, এই কাপড়-চোপড় বাসায় গিয়ে লন্ড্রিতে পাঠিয়ে দেবেন।

আরিফ বলল, আবসার না আসা পর্যন্ত যাব না। আমি হোটেল থেকে খেয়ে এসে বাইরে থাকব। দরকার হলে ডাকবেন।

রীমা আতঙ্কিত স্বরে মিনতি করল, না আরিফ ভাই না। আপনাকে থাকতে হবে না। আপনি একটা কলেরা রুগীকে দু'হাতে জড়িয়ে ভিতরে এনেছেন। একজন উচ্চশিক্ষিত ছেলে হয়ে এটা জানেন না, আপনার সর্ব প্রথম কর্তব্য হল, সাবান দিয়ে গোসল করে অন্য পোশাক পরা!

আরিফ মৃদু হেসে বলল, আপনার কথা অস্বীকার করছি না; তবে আপনি বোধ হয় জানেন না, সাবধানের যেমন মার নেই, তেমনি মারের সাবধান নেই।

রীমা বলল, দোহাই আপনার, কথা না বাড়িয়ে যা বললাম তাই করুন।

আরিফ বলল, আপনি তো মায়ের জাত, তাই সব কিছুতেই অমঙ্গল চিন্তা করেন।

রীমা অধৈর্য হয়ে বলল, আহ আরিফ ভাই, তর্ক না করে শিগ্‌গির বাসায় যান।

আরিফ দৃঢ়স্বরে বলল, আপনি ওগুলো নিয়ে ভিতরে যান। আবসার আসার পর আপনার আদেশ পালন করব।

রীমা জানে আরিফ ভাই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করে না, তাই তার কথা শুনে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল।

আরিফ আগের জায়গায় বসার জন্য আসবার সময় দেখল, ফয়সাল ফুটপাতে একটা গাছের ছায়ায় বসে আছে। তার কাছে এসে পাশে বসে বলল, তখন আপনি মেয়েটিকে সাহায্য করতে আমার সঙ্গে এলেন না কেন? কোন অসুখকেই ভয় করা উচিত নয়।

ফয়সাল বলল, আমাকে ভুল বুঝবেন না। অসুখকে ভয় করে নয়, মেয়েরুগী বলে যাইনি।

ঃ কেন? রুগী রুগীই। সে মেয়ে হোক অথবা পুরুষ হোক। বিপদের সময় মেয়ে-পুরুষ বিচার করা অজ্ঞতার পরিচয়।

ঃ বেগানা মেয়ের গায়ে হাত দেওয়া শক্ত গোনাহ।

আরিফ খুব অবাক হয়ে বলল, আপনি নিশ্চয় পড়াশুনা করছেন?

ঃ জ্বী, আলিয়া মাদ্রাসার ফাজেলের ছাত্র।

ঃ তবু এমন কথা বলতে পারলেন?

ঃ কেন? কোন অন্যায় বলেছি নাকি?

ঃ নিশ্চয়ই।

ঃ আপনারা কোরআন-হাদিস পড়েন নি, আপনাদের ন্যায়-অন্যায় বোধ অন্য রকম।

ঃ আপনার কথা মানতে পারলাম না। আমি মাদ্রাসায় না পড়লেও আল্লাহপাকের রহমতে অনেক ধর্মীয় বই পড়েছি। কোরআন-হাদিসের ব্যাখ্যাও পড়েছি। সেগুলোর মধ্যে বিপন্না নারীকে সাহায্যার্থে তার গায়ে হাত দিলে শক্ত গোনাহ হবে, একথা কোথাও পাইনি। জানেন না বুঝি, খুব বড় বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য মিথ্যা বলা জায়েজ? হারাম খাদ্য ছাড়া বাঁচার অন্য কোন উপায় না থাকলে, হারাম খাওয়া জায়েজ। অবশ্য বিপদ দূর হলে এবং হালাল খাবার পাওয়া গেলে ঐ সব নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তখন আল্লাহপাকের কাছে তওবা করে মাফ চেয়ে নিতে হয়। আসল কথা কি জানেন, মানুষ যা কিছু করুক না কেন আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে করলে তাকে গোনাহ স্পর্শ করতে পারে না। সব থেকে বড় কথা, মানুষ জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে সেগুলো মেনে চলবে এবং আল্লাহকে ভয় করে নিজেকে চরিত্রবান করে গড়ে তুলবে। তা যদি কেউ করতে পারে, তাহলে শয়তান তাকে দিয়ে কোন গোনাহর কাজ করাতে পারবে না। একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না, আমি যতটুকু জ্ঞান লাভ করেছি, তাতে করে আমার মনে হয়, ধর্ম শুধু কিছু আনুষ্ঠানিক জিনিস নয়। ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হল একত্ববাদ এবং নির্মল চরিত্র গঠন। হাদিস সম্বন্ধে আপনি আমার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন; তবু একটা হাদিস না বলে পারছি না—"রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মুসলমানদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে অধিক ধর্ম ভীরু ও চরিত্রবান।" আর একটা কথা মনে রাখবেন, সমস্ত মানবকুলের উপকার করাই ইসলাম ধর্মের প্রধান হুকুমগুলোর মধ্যে অন্যতম।

এমন সময় আবসারকে আসতে দেখে বলল, এবার আসি, আমার কথায় মনে কিছু নিবেন না। তারপর সালাম বিনিময় করে আবসারের দিকে এগিয়ে গেল।

আবসার সাড়ে তিনটের সময় ফিরে এসে আরিফকে দেখে বলল, তোর জন্য ভাত এনেছি।

আরিফ বলল, তোর বৌয়ের হুকুম বাসায় গিয়ে সাবান দিয়ে গোসল করে জামা-কাপড় পরে তারপর যেন খাই।

ঃ এরকম হুকুম জারি করার পিছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে?

ঃ সেটা তোর বৌকেই জিজ্ঞেস করিস— বলে আরিফ বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। পথে আরিফের মনে ঐ মেয়েটির ছবি ভেসে উঠল। ভাবল, এখন কেমন আছে আল্লাহকে মালুম। বাসায় এসে গোসল ও খাওয়া-দাওয়া করে হাসপাতালে যখন ফিরে এল তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। খায়ের সাহেবের বেডের কাছে এসে তখনও স্যালাইন চলছে দেখে আবসারকে জিজ্ঞেস করল, কিরে খালুজান এখন কেমন আছেন?

আবসার বলল, খিচুনি বন্ধ হয়েছে।

রীমা জায়গা ছেড়ে দিয়ে বলল, বসুন আরিফ ভাই।

ঃ আপনি বসুন তো।

ঃ আমি অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি, এবার একটু দাঁড়াই।

আরিফ বসে তাকেই উদ্দেশ্য করে বলল, ভাবী, ঐ মেয়েটি কেমন আছেন জানেন

রীমার ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলে গেল। বলল, পাশের ওয়ার্ডের দরজা দিয়ে ঢুকে ডান দিকের বেডে মেয়েটা আছে। যান, গিয়ে দেখে আসুন। আমি কিছুক্ষণ আগে গিয়ে দেখে এসেছি। অবস্থা তেমন ভাল নয়। তার কাছে যে বয়স্কা মেয়েটি রয়েছে, তাকে আমি মেয়েটার বাবা-মার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম বলল, মা নেই, বাবা আছেন। তিনি গতকাল রাজশাহী গেছেন। দু'তিন দিন পর ফিরবেন।

আরিফ মেয়েটির বেডের কাছে এসে বয়স্কা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, এখন কেমন আছে?

বয়স্কা মেয়েটির নাম আকাশী। সে বলল, বমি বন্ধ হয়েছে; কিন্তু পায়খানা সমানে হচ্ছে।

আরিফ আবার জিজ্ঞেস করল, বাসায় কে কে আছে?

আকাশী বলল, একজন কাজের লোক, একজন মালি ও একজন কাজের মেয়ে আছে। সাহেবের আর কোন ছেলে-মেয়ে নেই। এই মেয়েকে দশ বছরের রেখে বেগম সাহেবা মারা গেছেন। আমি সাহেবের দেশের মেয়ে। বেগম সাহেবা মারা যাবার পর আমি একে মানুষ করেছি।

আরিফ তার কাছ থেকে তাদের বাসার ঠিকানা জেনে নিয়ে আবসারের কাছে এসে বলল, আমি মেয়েটার বাসা থেকে একটু আসছি। তারপর ডাক্তার ও নার্সদের মেয়েটির দিকে লক্ষ্য রাখতে বলে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল।

আকাশী ঠিকানা বলেছিল— বনানী, বাড়ীর নাম্বার আটষট্টি। আরিফ গেটের বাইরে এসে একটা বেবী নিয়ে রওয়ানা দিল। ঠিকানা মত পৌঁছে গেটে দারোয়ানের কাছে বাধা পেল।

দারোয়ান জিজ্ঞেস করল, কাকে চান? বাড়ীতে কেউ নেই।

আরিফ বলল, তা জানি। আমি মহাখালী কলেরা হাসপাতাল থেকে এসেছি। আপনাদের সাহেবের মেয়ের অবস্থা তত ভাল নয়। সাহেবকে ফোন করে জানাবার জন্য এসেছি। বাসার কাজের লোকটিকে ডাকুন।

দারোয়ান বলল, আপনি সোজা চলে যান। বারান্দায় কলিং বেল আছে।

গেট দিয়ে ঢুকে আরিফের চোখ জুড়িয়ে গেল। গেট থেকে বেশ দূরে দ্বিতল ...মিক ইটের কারুকার্যখচিত বাড়ী। বাড়ীটার সামনে বিভিন্ন ফুলের গাছ। কত ...মের যে ফুল ফুটে রয়েছে, আরিফ তাদের বেশির ভাগ নাম জানে না। একজন মালি প্লাস্টিকের পাইপ ধরে ফুল গাছে পানির ফোয়ারা দিচ্ছে। লোকটা আরিফের দিকে একবার চেয়ে নিজের কাজ করতে লাগল। আরিফ পা চালিয়ে বারান্দায় এসে কলিংবেলের বোতামে চাপ দিল।

মিনিট খানেক পরে একটা বয়স্ক দাড়িওয়ালা লোক দরজা খুলে বেশ অবাক হয়ে আরিফের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

আরিফ সালাম দিয়ে বলল, আমাকে চিনবেন না। আমি হাসপাতাল থেকে আসছি। সাহেবের মেয়ের অসুখ খুব বাড়াবাড়ি। রাজশাহীতে সাহেবকে ফোন করতে হবে। আপনি সেখানকার টেলিফোন নাম্বার জানেন?

লোকটির নাম আসগর। সে সালামের উত্তর দিয়ে বলল, আমি টেলিফোন নাম্বার জানি না। আপনি আমার সঙ্গে আসুন, টেলিফোনের টেবিলে একটা বই আছে। সেটা দেখে সাহেবকে ফোন করতে দেখেছি। তাতে হয়তো থাকতে পারে।

আরিফ তার সঙ্গে ভিতরে এসে দেখল, টেবিলের উপর একটা টেলিফোন ইনডেক্স রয়েছে। সেটা নিয়ে রাজশাহীর তিন-চারটে নাম্বার দেখতে পেয়ে একটার পর একটা ডায়াল করে চলল। কিন্তু রিং হলেও ধরছে না। শেষে লাস্ট নাম্বারে ডায়াল করতে ওপারে একজন লোকের গলা পাওয়া গেল। টেলিফোন করার আগে আরিফ আসগরের কাছে সাহেবের নাম জেনে নিয়েছিল। ওপারের লোকটা হ্যালো বলতে আরিফ সালাম দিয়ে বলল, আমি ঢাকা থেকে ফোন করছি, এখানে কি ইলিয়াস সাহেব আছেন?

লোকটি সালামের উত্তর দিয়ে বলল, না, নেই। উনি একটা কাজে বাইরে গেছেন। আপনি কে বলছেন?

ঃ আমাকে চিনবেন না। আপনি ইলিয়াস সাহেবকে দয়া করে বলবেন, ওনার মেয়ের ডাইরীয়া হয়েছে। মহাখালী কলেরা হাসপাতালে আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসতে বলবেন।

লোকটি আতঙ্কিত স্বরে বলল, তাই নাকি! ঠিক আছে, আমি ওনাকে খবরটা দেবার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু আপনার নামটা অন্তত বলুন।

আরিফ নাম বলে সালাম দিয়ে ফোন ছেড়ে দিল। তারপর সেখান থেকে হাসপাতালে ফিরে এসে দেখল, ঝিচুনি বন্ধ হয়েছে। সাহেবকে ফোন করার কথা আকাশীকে বলে বলল, আপনি চিন্তা করবেন না, আমি বাইরে থাকব। দরকার মনে করলে ডাকবেন।

আরিফ যখন সাহেবের মেয়েকে বেবী থেকে হাসপাতালের ভিতর নিয়ে আসে তখন কৃতজ্ঞতায় আকাশীর চোখে পানি এসে গিয়েছিল। এখন তার কথা শুনে আবার চোখে পানি এসে গেল। চোখ মুছে ভিজে গলায় বলল, আপনি যা করছেন তা অতি আপনজনও করবে না। আল্লাহ আপনার ভাল করবেন।

আরিফ বলল, আমি কি আর করছি মা, সবকিছু আল্লাহপাকের ইচ্ছা। তারপর জিজ্ঞেস করল, আপনি কি হাসপাতালের খাবার খেতে পারেন, না আমি হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসব?

আকাশী বলল, আমি হাসপাতালের খাবারই খাব। হোটেল থেকে কিছু আনতে হবে না। আরিফ আর কিছু না বলে খায়ের সাহেবের বেডের কাছে এসে ওঁর স্ত্রীকে বলল, খালাআম্মা, আবসার কি ভাবীকে নিয়ে বাসায় গেছে?

আকলিমা বেগম বললেন, হ্যাঁ বাবা, বৌমাকে রেখে রাতের খাবার নিয়ে আসবে।

আরিফ বলল, আমি বাইরে আছি, ও এলে দেখা হবে।

আকলিমা বেগম কিছু না বলে চুপ করে রইলেন।

রাত আটটার সময় আবসার ভাত নিয়ে এসে আরিফকে দেখে বলল, কিরে তুই এখনো আছিস?

ঃ তাতো দেখতেই পাচ্ছিস।

ঃ মেয়েটার বাসায় গিয়ে কোন কাজ হল?

ঃ রাজশাহীতে ফোন করেছিলাম; কিন্তু ওর বাবাকে পাইনি, তবে যে লোক ফোন ধরেছিল, তাকে খবরটা ওর বাবাকে জানাতে বলেছি।

ঃ চল, ভাতটা মাকে দিয়ে আসি। সেই সাথে মেয়েটাকেও দেখে আসব।

দু'জনে ভিতরে এসে বাবার বেডের কাছে আবসার ভাতের টিফিন বাক্সটা রাখল।

ওদের দেখে আকলিমা বেগম বললেন, বমি আর হয়নি। পায়খানাও কমেছে। তোরা বাসায় যা। সকালে আসবি।

আবসার বলল, সে দেখা যাবে, আমরা ঐ মেয়েটাকে একটু দেখে আসি। তারপর মেয়েটার বেডে গিয়ে আকাশীর কাছে শুনল পায়খানা-বমি কমলেও এখনো জ্ঞান ফিরেনি।

আরিফ আকাশীকে বলল, আমি মাঝে মাঝে এসে খোঁজ নেব। তারপর বাইরে এসে আবসারকে বলল, তুই বাসায় চলে যা, আমি তো রয়েছি। আবসার রাজি না হতে জোর করে তাকে একটা বেবীতে তুলে দিল।

পরের দিন সকালে রীমা তার দেবর সাকিলকে নিয়ে এল। রীমা সাকিলের সঙ্গে আকলিমা বেগমকে বাসায় পাঠিয়ে দিল। বেলা বারোটার সময় খায়ের সাহেবের অবস্থার উন্নতি হলে তিনি বাসায় ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। আবসার ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে বাবাকে নিয়ে বাসায় চলে গেল।

যাবার আগে ঐ মেয়েটির কথা মনে পড়তে তাকে দেখতে গেল। গিয়ে দেখল তার জ্ঞান ফিরেছে। জিজ্ঞেস করল, এখন কেমন আছেন?

ঃ ভাল, কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না।

ঃ আমাকে চিনবেন না। গতকাল আমার বাবাকে নিয়ে এখানে এসেছি। যে ছেলেটা আপনাকে সাহায্য করেছে আমি তারই বন্ধু। এখন বাবাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। তাই ভাবলাম, আপনাকে একটু দেখে যাই। আচ্ছা এবার আসি, আল্লাহ্ হাফেজ।

ঐ মেয়েটির নাম ফাল্গুনী। সকালের দিকে জ্ঞান ফিরে পেয়ে চারদিকে চেয়ে বুঝতে পারল, হাসপাতালে আছে। আকাশীকে জিজ্ঞেস করল, খালা, আমাকে এখানে কখন নিয়ে এলে?

আকাশী বলল, গতকাল বেলা দুটোর সময় তুমি যখন অজ্ঞান হয়ে গেলে তখন একটা বেবিতে করে নিয়ে আসি। তারপর কিভাবে আরিফ তাকে সাহায্য করল সে কথা বলে আরো বলল, মনে হয় ছেলেটা এখনো বাইরে বসে আছে। রাতে কয়েকবার তোমাকে দেখে গেছে। ডাক্তার ও নার্সকে তোমার দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছে। এই তো কিছুক্ষণ আগেও এসেছিল। আবার হয়তো আসবে।

ফাল্গুনী জিজ্ঞেস করল, আব্বাকে খবর দেওয়া হয়েছে?

আকাশী বলল, ঐ ছেলেটা আমার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে বাসায় গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, রাজশাহীতে টেলিফোন করে খবর দেওয়া হয়েছে।

ফাল্গুনীর মন আরিফের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। ভাবল, যার মধ্যে এত মানবতা রয়েছে নিশ্চয় সে দেখতেও সুন্দর। আকাশীকে বলল, তাকে ডেকে নিয়ে এস।

আকাশী বাইরে এসে আরিফকে পেল না। ফিরে এসে বলল, তাকে পেলাম না।

আরিফ ভোরে মেয়েটিকে দেখে মসজিদে ফযরের নামাজ পড়তে গিয়েছিল। নামাজ পড়ে পাঞ্জে সূরা তেলাওয়াত করে মেয়েটির রোগমুক্তির জন্য দোওয়া করল। তারপর এসরাকের নামাজ পড়ে ফিরে আসার সময় চিন্তা করল, মেয়েটি যদি ভাল থাকে, তাহলে বাসায় গিয়ে গোসল ও খাওয়া-দাওয়া করে আসবে। হাসপাতালে ঢুকে ওয়ার্ডের কাছে গিয়ে দেখল, মেয়েটির জ্ঞান ফিরেছে। মনে মনে আল্লাহ্পাকের শোকর গোজারি করে বেডের কাছে এসে তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, এখন কেমন বোধ করছেন? সারারাত খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম।

আরিফের রাতজাগা মলিন চেহারা দেখে ফাল্গুনীর মন ব্যথায় টনটন করে উঠল। তারপর কয়েক সেকেন্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ভিজে গলায় বলল, আপনাকে

কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই। আকাশী খালার মুখে যা শুনেছি তা অতি আপনজনও করে না।

আরিফ বলল, কি আর এমন করেছি। আল্লাহর কাছে দোওয়া করি, তিনি যেন আপনাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে দেন। এখন আমি একটু বাসায় যাব, পরে আবার আসব।

ফাল্গুনী কিছু বলার আগে আকাশী বলল, হ্যাঁ বাবা তাই যান। সারারাত কষ্ট তো আর কম করেননি? বাসায় গিয়ে বিশ্রাম নিন।

আরিফ ফাল্গুনীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, আসি কেমন? তারপর সেখান থেকে বাসায় এসে গোসল করে নাস্তা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

দুপুরে ওমরের ডাকাডাকিতে ঘুম থেকে উঠে বলল, এত ডাকাডাকি করছ কেন ওমর চাচা?

গোফরান সাহেব আর সুফিয়া বেগম সাড়ে তিন বছরের আরিফকে যখন নিয়ে আসে তখন তাকে দেখাশুনা করার জন্য গোফরান সাহেব ওমরকে মাসিক বেতনে নিজের বাড়ীতে এনে রাখে। আরিফের সঙ্গে সবসময় থাকাটাই ওমরের কাজ। তাকে অন্য কোন কাজ করতে দেওয়া হয় না। বলাবাহুল্য, নেসার ফকিরের দোওয়ার বরকতে এই ওমরেরই লুলো পা ভাল হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক আরিফ যতদিন গ্রামের বাড়ীতে লেখাপড়া করেছে, ততদিন ওমর তার নিত্যসঙ্গী ছিল। ঢাকায় পড়তে আসার সময় গোফরান সাহেব ও সুফিয়া বেগম তাকে আরিফের সেবাযত্ন করার জন্য আলাদা বাসা ভাড়া নিয়ে ওমরকে তার কাছে রেখেছে। মাঝে মাঝে গোফরান সাহেব ও সুফিয়া বেগম এসে বেশ কিছুদিন থেকে আবার চলে যান। তারা সময়মত ওমরের বিয়ে দিয়েছেন। বৌয়ের নাম আনোয়ারা। আনোয়ারা গরিব ঘরের মেয়ে। কিন্তু খুব কর্মঠ ও স্বামীভক্ত। ওমরকে সব সময় আরিফের কাছে থাকতে হয়। আরিফ যখন বাড়ী যায় তখন ওমরও তার সঙ্গে যায়। গোফরান সাহেব ও সুফিয়া বেগম আনোয়ারাকে নিজেদের কাছে রেখেছেন। তাদের কোন ছেলেমেয়ে হয়নি।

আরিফের কথা শুনে ওমর বলল, কাল সারাদিন ও সারারাত কোথায় ছিলেন? বন্ধুর বাসায় যাবার কথা বলে সেই যে গেলেন আর ফিরলেন না। আমি সারারাত জেগে কাটিয়েছি। সকালে এসে নাস্তা খেয়ে ঘুমিয়েছেন, এখন বেলা দুটো বাজে। ডাকাডাকি করব না তো কি করব? খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত না করলে শরীর টিকবে কেন? সাহেব-বেগম এসে আপনার শরীর রোগা হয়ে গেছে দেখলে, আমাকে বকাবকি করবেন।

ওমর নিরেট মূর্খ। দেশে থাকাকালীন সময়ে ওমর তাকে ছোটবেলা থেকে একরকম মানুষ করেছে বলে তুমি করেই বলত। ঢাকায় আসার পর আরিফ তাকে কিছু কিছু বাংলা-ইংরেজী শিখিয়েছে। কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তাও শিখিয়েছে। প্রথম দিকে ওমর অভ্যাসমত সবাইকে তুমি করে বলত। তারপর আরিফের কথামত এখন আর সেরকম করে না। বেশ শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে পারে।

আরিফ বিছানা ছেড়ে উঠে বাথরুমে যাবার সময় বলল, তুমি যাও, আমি নামাজ পড়ে ভাত খাব।

খাওয়া-দাওয়ার পর আরিফ ওমরকে বলল, আচ্ছা ওমর চাচা, কখনো কখনো কারো দিকে তাকালে তার ভূত-ভবিষ্যৎ দেখতে পাই, তার মনের কথা বুঝতে পারি, এরকম কেন হয় বলতে পার?

ওমর আরিফের আসল পরিচয় জানে। তার মা বাবাকে ও নানা নানীকে জানে আরও জানে আরিফের ছোট বেলার ইতিহাস। আরিফের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন একদিন মাদ্রাসা থেকে ঘরে ফেরার সময় ওমরকে বলল, ওমর চাচা, এ বছর গ্রামে বসন্ত হয়ে অনেক লোকজন ও ছেলেমেয়ে মারা যাবে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কয়েকটা ছেলেমেয়ের নাম বলে বলল, এরাও মারা যাবে। এর আগেও আরিফ ওমরকে এমন কিছু কথা বলেছিল যা কিছুদিনের মধ্যে ঘটেছিল। তখন ওমর মনে করেছিল, আরিফ পরীর পেটে জন্মেছে, তাই হয়তো আগাম ঘটনা জানতে পারে। তারপর যখন আরিফ গ্রামে বসন্ত হয়ে অনেকে মারা যাবার কথা বলল তখন ওমর ভাবল, এই কথা গ্রামের লোকজন জানতে পারলে খুব খারাপ হবে। ঘরে এসে গোফরান সাহেবকে সে কথা জানিয়ে বলল, আগেও সে আমাকে এরকম যত কথা বলেছে তা সব সত্য হয়েছে।

গোফরান সাহেবের তখন নেসার ফকিরের কথা মনে পড়ল। আরিফ যে এরকম কথা বলবে তা তিনি বলেছিলেন। ওমরকে বলল, তুমি এসব কথা অন্য কাউকে বলবে না।

ওমর মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চলে গেল।

গোফরান সাহেব স্ত্রীকে ওমরের কথা বলে জিজ্ঞেস করল, আরিফের বয়স কত হল বল তো?

সুফিয়া বেগম হিসাব করে বলল, পাঁচ বছর পার হয়েছে। নেসার ফকির যে তাবিজ পরাবার জন্য দিয়েছিলেন তার এখনো এক বছর দেরি আছে। তারপর আরিফের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বলল, তুমি তোমার ওমর চাচার কাছে যে সব কথা বলেছ, সে সব অন্য কারো কাছে বলো না। আবার যখন এরকম কথা তোমার মনে হবে তখন ওমরকে বা অন্য কারো কাছে না বলে আমাদের কাছে বলবে।

সে বছর সত্যি সত্যি বসন্ত হয়ে অনেক লোক মারা গিয়েছিল। এর কিছুদিন পর আরিফ স্কুলে ভর্তি হল। একদিন স্কুল থেকে ফিরে মা বাবাকে বলল, সামসু চাচা আজ আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চেয়েছিল; কিন্তু আমার গলায় চাপ দিতে পারেনি। কয়েকবার চেষ্টা করে যখন পারল না তখন বলল, তোর মা পরী ছিল তাই বেঁচে গেলি। তারপর ওমর চাচাকে আসতে দেখে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

সুফিয়া বেগম ভয়ার্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, তোর ওমর চাচা তোকে রেখে কোথায় গিয়েছিল?

আরিফ বলল, সে আমাকে রাস্তার একপাশে দাঁড়াতে বলে একটু দূরে পায়খানা করতে গিয়েছিল।

গোফরান সাহেব জিজ্ঞেস করল, তাকে এই কথা বলেছ নাকি?

আরিফ মাথা নেড়ে বলল, না। তারপর মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আচ্ছা আম্মা, সামসু চাচা আমাকে মেরে ফেলতে চায় কেন? আর কেন সে বলল, আমার মা পরী ছিল? তাহলে তুমি কে?

সুফিয়া বেগম চমকে উঠে আরিফকে বুকে জড়িয়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, তোর সামসু চাচা মিথ্যে বলেছে। তার কথা বিশ্বাস করিস না। সে আমাদের সকলের দুশমন।

গোফরান সাহেব বলল, হ্যাঁ বাবা, তোমার আম্মা ঠিক কথা বলেছে। সামসু আমার চাচাতো ভাই হলে কি হবে আমাদের দুশমন। তোমাকে মেরে ফেললে, সে আমাদের সব সম্পত্তি পাবে, তাই তোমাকে মেরে ফেলতে চায়। তারপর ওমরকে ডেকে বলল,

তুমি আরিফকে রাস্তাঘাটে একা রেখে কোথাও যাবে না। আজ রাস্তায় রেখে তুমি যখন পায়খানা করতে গিয়েছিলে, সেই সময় সামসু ওকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তোমাকে আসতে দেখে পালিয়ে যায়।

ওমর চমকে উঠে বলল, তাই নাকি দাদা? আমিও এবার সজাগ থাকব, দেখব কে আরিফের গায়ে হাত দেয়।

তার পর আরিফের বয়স সাত বছর হতে গোফরান সাহেব ও সুফিয়া বেগম নেসার ফকিরের কথা মত তার গলায় একটা তাবিজ বেঁধে দিল।

গোফরান সাহেবের চাচাতো ভাই সামসু। সেও বাবা-মার একমাত্র সন্তান। তার চার মেয়ে ও এক ছেলে। ছেলেটা সবার ছোট। নাম রফিক। রফিক খুব দুরন্ত ছেলে। কোন কিছুতে ভয় পায় না। তার সঙ্গে আরিফের খুব ভাব। আরিফও তার বাবার প্রথম জীবনের মত ডানপিটে হয়েছে। গ্রামের বয়স্ক লোকেরা আরিফকে গোফরান সাহেবের শালার ছেলে এবং নেসার ফকিরের নাতি বলে জানলেও অনেকে গোফরান সাহেবের ছেলে বলেই জানে। তাই আরিফের ডানপিটে স্বভাবের কথা জেনেও কেউ কিছু বলে না। কিন্তু সামসু আরিফের সব কিছু জানে। গোফরান সাহেবের ছেলেমেয়ে হয়নি বলে সে খুব খুশি ছিল। কারণ নিঃসন্তান চাচাতো ভাইয়ের মালিক সে একসময় হত। গোফরান আরিফকে পোষ্যপুত্র করায় তার সে আশায় বাজ পড়ে। তাই সে আরিফকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চায়। আল্লাহপাকের কি কুদরত, সামসুর ছেলে রফিকের সঙ্গে আরিফের বন্ধুত্ব দিনের পর দিন গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে থাকে। ছোটবেলা থেকে দু'জনের স্বভাব-চরিত্রও প্রায় একই রকম। তারা যত বড় হতে লাগল, তত গ্রামের লোকজন তাদের দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। গোফরান সাহেব ও সুফিয়া বেগম শাসন করতে পারে না, তবে অনেক বোঝায়। কিন্তু কোন কাজ হয়নি।

সামসুও ছেলেকে আরিফের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করে, অনেক বোঝায় এবং তাতে কাজ না হতে শাসনও করেছে; কিন্তু ফলাফল কিছুই হয়নি। শেষে সামসু ছেলে বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর যখন ম্যাট্রিক পাস করল তখন একদিন রফিককে আরিফের আসল পরিচয় জানিয়ে বলল, ও পরীর পেটে হয়েছে। ওর সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দে। ওর নানার জীন-পরীর সাথে কারবার ছিল। সেও একদিন তাই করবে। ওর সাথে সব সময় একজন জীন থাকে। সেই জীন তোর ক্ষতি করতে পারে। তাছাড়া ও পরের ছেলে। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। ও না থাকলে তোর গোফরান চাচার সব সম্পত্তির মালিক আমরা হতাম। আরিফের বাপেরও অনেক বিষয়-সম্পত্তি ও ব্যবসাপত্র আছে। সে সব ওর চাচা ভোগদখল করছে। বড় হয়ে আরিফ সেসব পাবে। তার উপর তোর গোফরান চাচার সব বিষয়-সম্পত্তি পেয়ে কত বড়লোক হয়ে যাবে। আর তুই কি পাবি? আমার আর কতটুকু আছে। ওকে এখান থেকে তাড়াতে পারলে তোর গোফরান চাচার সবকিছু তুই পাবি। তারা আরিফকে তার আসল মা-বাপের কথা বলেনি। তুই তাকে বলবি। বললে, আরিফ মনে কষ্ট পেয়ে তার চাচার কাছে চলে যাবে। তারপর গোফরান ও তার বৌ মারা যাবার পর তাদের সম্পত্তি তুই একা পেয়ে যাবি।

রফিক বাবার কথা শুনে বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারটা যতটা না বিশ্বাস করল, তার চেয়ে জীন-পরীর কথাটা বেশি বিশ্বাস করল। কারণ তখন তার গত বছরের একদিনের ঘটনা মনে পড়ল। তখন গরমের সময়। স্কুল বন্ধ। অনেক দিন বৃষ্টি না হওয়ায় গরম খুব জানাচ্ছে। সেদিন দুপুরের পর লোকজন যখন ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে তখন ওরা দু'জন কবরস্থানের পাশে যেখানে নেসার ফকির ঘর করে বসবাস করেছিলেন, সেখানে গেল।

এখন সেখানে ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই। জঙ্গলে ভরে গেছে। তবে নেসার ফকির চলে যাবার পর অনেক গরিব মেয়ে জ্বালানির জন্য গাছের শুকনো পাতা ও ডালপালা নিতে সেখানে যায়। কিন্তু আগের মত কেউ আর অসুস্থ হয়ে মারা যায় না। নেসার ফকির তিন-চারটে নারকেল গাছ লাগিয়েছিলেন। সেগুলোতে প্রচুর নারকেল হয়। কেউ সেসব পেড়ে আনতে সাহস পায় না। গাছেই ঝুনো হয়ে যখন পড়ে তখন ঐসব গরিব মেয়েরা কুড়িয়ে নিয়ে আসে। আগের দিন বিকেলে দু'বন্ধুতে অন্য গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিল। ফেরার পথে কবরস্থানের পাশ দিয়ে আসবার সময় সেই সব গাছে প্রচুর ডাব দেখেছে। তাই আজ দু'জনে যুক্তি করে একটা বড় চাকু নিয়ে এখানে ডাব খেতে এসেছে। দু'জনেই গাছে চড়তে ওস্তাদ। সেখানে এসে আরিফ বলল, প্রতিদিন এখানে ডাব খেতে আসব, কি বলিস!

রফিক বলল, তুই ঠিক বলেছিস। শালা এইসব গাছে এত ডাব আছে আগে জানলে গ্রামের লোকের ডাব চুরি করে খেতাম না। রফিক ও আরিফদের প্রচুর ডাব গাছ থাকলেও তারা দুষ্টুমি করে অন্যের গাছের ডাব খেত।

আরিফ বলল, আজ আমি উঠি, কাল তুই উঠিস। তারপর সে তরতর করে গাছে উঠে ডাব পেড়ে নামার সময় মেথীর কাছ থেকে হাত ফসকে পড়ে গেল।

রফিকের বুক ধড়াস করে উঠল। ভাবল, অত উঁচু থেকে পড়ে আরিফ হয়তো মরেই গেল। ভয়ে ও আতঙ্কে কয়েক সেকেন্ড নড়তে-চড়তে পারল না। তারপর আরিফকে উঠে হাত-পায়ের ধুলো ঝাড়তে দেখে খুব অবাক হল। তার কাছে এসে বলল, কিরে তুই বেঁচে আছিস? আমি মনে করেছি তুই মরেই গেছিস। যা ভয় পেয়েছিলাম না।

আরিফ বলল, আরে মরণ কি এতই সহজ। যার যখন হায়াৎ শেষ হবে, সে তখন মরবে। হায়াৎ থাকতে কেউ মরে না, বুঝলি।

রফিক বলল, তা না হয় বুঝলাম; কিন্তু অত উঁচু থেকে পড়ে গেলি অথচ তোর হাত পা ভাঙল না, এটা খুব অবাক লাগছে।

আরিফ বলল, তোর মত আমিও খুব অবাক হচ্ছি। হাত ফসকে যেতে ভাবলাম, পড়ে গিয়ে হয়তো মরেই যাব অথবা হাত-পা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে। সে কথা ভেবে খুব ভয় পেয়ে চোখ বন্ধ করে নিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল কেউ যেন আমাকে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিল। দেখ না পড়ে গিয়ে আমার গায়ে একটুও আঁচড় লাগেনি। এই কথা বলে হাত-পা দেখাল।

রফিক বলল, আব্বা একদিন আমাকে এদিকে আসতে নিষেধ করেছিল। এখানে নাকি জীন-পরীরা বাস করে। তাদেরই কেউ হয়তো তোকে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে। তাই তোর কোন ক্ষতি হয়নি।

আরিফ বলল, আমাকেও আব্বা একদিন ঐ কথা বলে এদিকে আসতে নিষেধ করেছিল। আমি কিন্তু ওসব বিশ্বাস করিনি।

রফিক বলল, বাদ দে ওসব কথা, এখন ডাব খাওয়া যাক।

ডাব খাওয়ার পর আরিফ বলল, ডাব গাছে উঠে উত্তর দিকে একটা পাকা কবর দেখেছি। চল দেখে আসি।

রফিক অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি! চল তো দেখি।

কবরের কাছে এসে তারা খুব অবাক হল। কবরটা যেন মাত্র কয়েক দিন আগে তৈরি হয়েছে। আরিফ বলল, কি ব্যাপার বল তো? প্রায় ছয়-সাত মাসের মধ্যে আমাদের গ্রামে কেউ মারা গেছে বলে শুনিনি। তাছাড়া কবর পাকা করার মত টাকা, আমাদের আর তোদের ছাড়া কার আছে?

রফিক বলল, আমিও সে কথা ভাবছি। আরো একটা কথা ভাবছি, মনে হচ্ছে কেউ যেন কবরের চারপাশ প্রতিদিন ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে।

আরিফ বলল, হ্যাঁ আমারও তাই মনে হচ্ছে।

রফিক বলল, চল এবার ঘরে যাই।

ফেরার পথে রফিক বলল, তুই যেন আবার ঘরে গিয়ে তোর আব্বা-আম্মাকে এসব কথা বলিসনা। তা না হলে তারা তোকে আর এদিকে আসতে দেবে না। এমনিতেই ওমর সব সময় তোর সঙ্গে থাকে।

আরিফ বলল, তুই পাগল হয়েছিস। একথা কাউকে বলব না। আর তুইও কাউকে বলবি না।

এর পর থেকে তারা প্রায়ই ডাব খেতে এখানে আসে।

আজ আব্বার মুখে আরিফের আসল পরিচয় পেয়ে রফিক ভাবল, আব্বার কথাই ঠিক, নচেৎ সেদিন অত বড় ডাব গাছ থেকে পড়ে গিয়েও তার কিছু হল না কেন? আর আরিফও সেদিন বলেছিল, তাকে কেউ যেন ধরে মাটিতে শুইয়ে দিল।

ছেলেকে চুপ করে থাকতে দেখে সামসু ভাবল, এবার হয়তো কাজ হবে। বলল, খবরদার আরিফের সঙ্গে মিশবি না, ওর সাথেও জীন-পরী থাকে।

রফিক কবরের কথাটা এতদিন কাউকে না বললেও আজ আব্বাকে জানাল।

সামসু শুনে চমকে উঠে বলল, সর্বনাশ! করেছিস কি? ঐ জায়গাটা হল জীন-পরীদের আড্ডা। আর ঐ কবরটা হল আরিফের মায়ের। জীন-পরীরা প্রতিদিন কবরের চারপাশ পরিষ্কার করে। আরিফ পরীর ছেলে, তাকে তারা কিছু বলবে না বরং সাহায্য করবে। তাই তো সেদিন গাছ থেকে পড়ে যাবার সময় জীনেরা তাকে ধরে নামিয়েছে। খবরদার, আর কখনও ঐদিকে যাবি না!

আব্বার কথাগুলো রফিকের দৃঢ় বিশ্বাস হল। বলল, ঠিক আছে আব্বা, আমি আর আরিফের সঙ্গে মিশব না, ঐ জায়গাতেও কোনদিন যাব'না। আর আরিফকে তার আসল পরিচয়ও জানাব।

সামসু চিন্তা করল এবার হয়তো তার মনের ইচ্ছা পূরণ হবে।

bdeboi.com

চার

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর হাতে অফুরন্ত সময়। তার উপর কয়েকদিন থেকে রফিকের পাত্তা নেই। পাশাপাশি বাড়ি হলেও আরিফ আব্বা-আম্মার কথা মত কোনদিন রফিকদের বাড়িতে যায় না। যেখানে যেখানে তারা ঘুরে বেড়ায়, আড্ডা দেয়, সেসব জায়গায় আরিফ খোঁজ করেও তাকে পেল না। ভাবল, সে হয়ত কোন আত্মীয়ের বাড়ি গেছে। কিন্তু তাকে না বলে সে তো কোনদিন কোথাও যায় না। কোন অসুখ-টসুখ করেনি তো? এই কথা মনে হতে তাদের চাকরকে জিজ্ঞেস করল।

চাকরটা বলল, সে তো কয়েকদিন আগে তার নানার বাড়ি গেছে।

শুনে তার প্রতি আরিফের অভিমান হল। আরো তিন-চার দিন পর এক সকালে রফিকের সাথে দেখা হতে বলল, কিরে আমাকে না বলে যে, নানার বাড়ি চলে গেলি? কবে ফিরলি?

রফিক বলল, কাল সন্ধ্যায় ফিরেছি। চল মক্তবের বারান্দায় বসি, তোর সাথে কথা আছে।

মক্তবের বারান্দায় বসে রফিক বলল, তোকে কয়েকটা কথা বলব, কিছু মনে করবি না। আমি কথাগুলো আগে জানতাম না, কয়েকদিন আগে জেনেছি।

আরিফ বলল, তোর কথায় কিছু মনে করব কেন? বল কি বলবি?

ঃ তোর আসল পরিচয় কি তুই জানিস?

ঃ আসল পরিচয় আবার কি?

ঃ তুই যাদেরকে মা-বাবা বলে জানিস, তারা কিন্তু তোর আসল মা-বাবা নয়। তারা হল তোর ফুফা-ফুফি। তুই হলি গোফরান চাচার ছোট শ্যালক জাকিরের ছেলে। তোদের বাড়ি এনায়েতপুরে। তোর মা-বাবা তোকে খুব ছোট রেখে মারা যায়। এই ফুফা-ফুফি তোকে ছেলের মত মানুষ করেছে।

আরিফ চমকে উঠে খুব অবাক হয়ে বলল, দূর! এসব একদম বাজে কথা। তোকে কে বলেছে বল তো?

রফিক বলল; বাজে কথা নয়, বিশ্বাস না হলে গোফরান চাচাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারিস। আর শোন, তোর নানার অনেক জ্বীন-পরী বশ ছিল। সে একটা পরীকে বিয়ে করেছিল। তার দেশ কোথায় কেউ জানে না। কবরস্থানের পাশে যেখানে আমরা ডাব খেতে যাই, সেখানে তোর নানা বেশ কয়েক বছর বসবাস করেছিল। তাদের একটা মেয়ে ছিল, সেই মেয়ে তোর মা। আর ঐখানে যে কবরটা আমরা দেখেছি, সেটা তোর মায়ের।

আরিফ আর একবার চমকে উঠে খুব গম্ভীর হয়ে চুপচাপ মাথা নিচু করে বসে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ পর রফিক বলল, কি রে কিছু বলছিস না কেন?

আরিফ মাথা তুলে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তুই এত কথা কার কাছে শুনেছিস?

ঃ আব্বার কাছে।

আরিফের তখন ছোট বেলার কথা মনে পড়ল, রফিকের আব্বা সামসু চাচা একদিন তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। সে কথা আব্বা-আম্মাকে বলতে তারা বলেছিল, সামসু আমাদের ও তোর দুশমন, তাই তোকে মেরে ফেলতে চায়। সেই থেকে তারা তাকে রফিকের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করে আসছে। আরিফ বলল, ঠিক আছে এসব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে একদিন না একদিন তা আমি জানতে পারব। এখন চলি পরে দেখা হবে। এই কথা বলে আরিফ ঘরের দিকে রওয়ানা দিল।

ঘরে এসে আব্বাকে পেল না। মাকে সংসারের কাজ করতে দেখে তাকে ঘরে নিয়ে এসে রফিক যা বলেছিল, তা সব বলল।

সুফিয়া বেগম শুনে আঁৎকে উঠে বলল, সব মিথ্যে কথা। কে তোকে এসব কথা বলেছে?

আরিফ বলল, এই কিছুক্ষণ আগে রফিক বলেছে। তাকে নাকি তার আব্বা বলেছে।

সুফিয়া বেগম আরিফকে বুকে জড়িয়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, ওরা আমাদের দুশমন। তুই ওদের কথা একদম বিশ্বাস করবি না। আমরা তোকে সেই ছোট বেলা থেকে রফিকের সঙ্গে মিশতে মানা করে আসছি। তুই তো আমাদের কথা শুনিসনি। তোর মনে নেই, রফিকের বাপ তোকে একবার গলা টিপে মেরে ফেলতে চেয়েছিল? তখন না পেরে এখন ছেলেকে দিয়ে মিথ্যে কথা বলে আমাদের প্রতি তোর

মন ভাঙাতে চাচ্ছে। আত্মীয়স্বজনরা সবাই আমাদের দুশমন। তুই কারো কথায় কান দিবি না। তারপর আরিফের একটা হাত নিজের মাথায় রেখে বলল, ওয়াদা কর। তুই যদি আমাকে মা বলে জানিস, তাহলে এখন থেকে জীবনে আর কোনদিন রফিকের সাথে মিশবি না, কারো কথায় কান দিবি না।

মায়ের চোখে পানি দেখে আরিফের চোখেও পানি এসে গেল। ভিজে গলায় বলল, হ্যাঁ আম্মা, আমি ওয়াদা করলাম।

সুফিয়া বেগম নিজের ও ছেলের চোখ মুছে তার মাথায় ও গালে চুমো খেয়ে বলল, মন দিয়ে পড়াশুনা কর। তোকে আমরা মানুষের মত মানুষ করব। গ্রামের কোন ছেলেরই সঙ্গে মেলামেশা করবি না।

তারপর থেকে আরিফ ও রফিকের মধ্যে বন্ধুত্বের ফাটল ধরলেও রফিকের কথাগুলো তাকে খুব ভাবিয়ে তুলল। তার প্রায়ই মনে হয়, ওরা শত্রু হলেও কথাগুলো সত্য বলেছে। এরপর তার স্বভাব-চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হল। এতদিন গোফরান সাহেব ও সুফিয়া বেগম তাকে নামাজ পড়ার জন্য কত বুঝিয়েছে; কিন্তু তাদের কথা কানে নেয়নি। এখন সে নিয়মিত নামাজ-কালাম পড়তে শুরু করল। ডানপিটে স্বভাবটাও আর নেই। বেশ ধীর ও গম্ভীর হয়ে গেল। আব্বার যত বাংলায় ধর্মীয় কেতাব ছিল, সব পড়তে শুরু করল।

গোফরান সাহেব ও সুফিয়া বেগম মনে করল, ছেলে বড় হবার সাথে সাথে স্বভাব চরিত্র পাল্টে গেছে। আরিফ ম্যাট্রিকে খুব ভাল রেজাল্ট করে সিরাজগঞ্জ কলেজে আই. এস. সি' তে ভর্তি হয়ে মন দিয়ে পড়াশুনা করতে লাগল। যে সময়গুলোতে রফিকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত, সেই সময়গুলো আরিফের যেন কাটতে চায় না। তার প্রায় সেই কবরটার কথা মনে পড়ে। সেখানে যেতে মন চায়।

একদিন বিকালে ওমরের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে কবরস্থানের দিকে যেতে লাগল।

ওমর বলল, ওদিকে যাচ্ছ কেন? ওদিককার জায়গা ভাল নয়।

আরিফ বলল, কেন? ভাল নয় কেন?

ঃ সে সব তোমার না শোনাই ভাল।

bdeboi.com

ঃ নাই ভাল হোক, তবু তুমি বল।

ওমর হাত বাড়িয়ে কবরস্থানের পাশের জায়গাটা দেখিয়ে বলল, ঐ জায়গায় জীন-পরীরা থাকে।

আরিফ বলল, আমি ও রফিক ওখানে প্রায় ডাব খেতে যেতাম। সে সময় একটা পাকা কবর দেখেছি। দেখে মনে হল, একদম নতুন। কবরের চারপাশে কেউ যেন প্রতিদিন ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে। জীন-পরী থাকলে ওখানে কেউ এসে ঝাড়ু দিতে পারত না। আচ্ছা ওমর চাচা, তুমি কি জান, ওটা কার কবর?

ওমর সব কিছু জানে। আরিফকে কোন কিছু জানাতে গোফরান সাহেবের নিষেধ। তাই বলল, শুনেছি ওটা কোন পরীর কবর। তাদেরই কেউ হয়তো প্রতিদিন ঝাড়ু দিয়ে যায়। ততক্ষণে তারা সেই জায়গার কাছাকাছি এসে পড়েছে। ওমর দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, ওখানে গিয়ে কাজ নেই, অন্য দিকে যাই চল।

আরিফ ওমরের কথার মধ্যে রফিকের কথার যেন একটু মিল খুঁজে পেল। বলল, চল না চাচা, এতদূর যখন এসেছি কবরটা একবার দেখে যাই, কবরটা দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। তারপর সে চলতে শুরু করল।

ওমর এক রকম বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে এগোল।

ফেরার পথে ওমর বলল, তুমি যেন একা একা এখানে আর কোনদিন এসো না। আর আজ যে এসেছিলে, সে কথা তোমার আব্বা-আম্মাকে বলো না।

ওমর চাচার কথা শুনে আরিফের মায়ের সাবধান বাণীর কথা মনে পড়ল, সেও তাকে এদিকে আসতে নিষেধ করেছে। কিন্তু তার মন যে মানে না। প্রতিদিন কবরের কাছে আসতে তার মন চায়। সেই জন্যে ওমরকে অন্য কাজে পাঠিয়ে প্রায়ই একাকি ঐ কবরের কাছে আসে। জীন-পরীর ভয়ের কথা তার মনেই পড়ে না। এভাবে দু'বছর পর আই. এস. সি. পাস করে আরিফ ঢাকায় ভার্সিটিতে জুওলজীতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হল।

গোফরান সাহেব নিজে ঢাকায় এসে একতলা, তিন কামরা সেপারেট বাসা ভাড়া নিয়ে আরিফের থাকার ব্যবস্থা করে দিল। তাকে দেখাশুনা ও রান্না করে খাওয়ানোর জন্য ওমরকে তার কাছে রেখে গেল।

সে সব আজ থেকে ছয় বছর আগের ঘটনা। এ বছর আরিফের মাষ্টার্স কোর্সের পরীক্ষা হবার কথা। কিন্তু সেসন জটের জন্য পিছিয়ে গেছে।

আজ যখন আরিফ খাওয়া-দাওয়ার পর ওমরকে জিজ্ঞেস করল, কারো দিকে তাকালে কখনো কখনো তার ভূত-ভবিষ্যৎ দেখতে পাই এবং কারো কারো মনের খবর বুঝতে পারি। তখন সে কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে বসে এই সব চিন্তা করছিল।

আরিফ বলল, কি হল ওমর চাচা, কিছু বলছ না কেন?

ওমর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমি মূর্খ মানুষ, কি করে বলব বাবা? আপনি আরো একটু ঘুমান, এত রোদে কোথাও যাবেন না।

আরিফ বলল, ঠিক আছে, তুমি এবার খেতে দাও।

আরিফ ভাত খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন তার ঘুম ভাঙল তখন বেলা সাড়ে চারটে। আসরের নামাজ পড়ে হাসপাতালে এসে প্রথমে খায়ের সাহেবকে বেডে দেখতে না পেয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, তিনি সুস্থ হয়ে বাসায় চলে গেছেন। তারপর ফাল্গুনীর বেডের কাছে গেল।

চারটের সময় রুগীদের লোকজনদের আসতে দেখে ফাল্গুনীর চোখ আরিফকে খুঁজতে লাগল। শেষে যখন পাঁচটা বেজে গেল তখন হতাশ হল, ভাবল, সে হয়তো আসবে না। আকাশীকে জিজ্ঞেস করল, খালা, ঐ ছেলেটা এল না কেন বলতো?

আকাশী বলল, কি করে বলব মা, হয়তো কোন কাজে আটকা পড়েছে। এমন সময় আরিফকে দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখে বলল, ঐ তো আসছে।

ফাল্গুনী এখন বেশ সুস্থ। সে বলল, আমাকে ধরে বসাও।

আকাশী তাকে বসিয়ে দিল।

আরিফ এসে বলল, বেশ দেরি করে ফেললাম, এখন আপনাকে সকালের চেয়ে একটু সুস্থ দেখাচ্ছে। আল্লাহ পাকের রহমতে নিশ্চয় আগের থেকে ভাল আছেন?

ফাল্গুনী সকালে রাত জাগা উসকো-খুসকো আরিফকে দেখেছিল। এখন ফ্রেশ দেখে মুগ্ধ হল। বলল, জ্বী, আগের থেকে সুস্থ বোধ করছি।

আকাশী বেডের তলা থেকে একটা টুল টেনে দিয়ে বলল, বসুন বাবা বসুন।

আরিফ বসে বলল, আসবার সময় আপনাদের বাসা হয়ে এলাম। আসগর বলল আপনার বাবা রাত্রে ফোন করেছিলেন। বলেছেন ভোরে রওয়ানা দেবেন। এতক্ষণে তো এসে যাবার কথা। হয়তো ফেরীর কারণে দেরি হচ্ছে।

ফাল্গুনী বলল, আপনি চলে যাবার পর আসগর চাচা এসে সে কথা বলে গেছে। আপনার পরিচয়টা বললে খুশি হব।

আরিফ নাম বলে বলল, আমি জুওলজীতে মাস্টার্স করছি, বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলার সমেশপুর গ্রামে।

ঃ হলে থাকেন?

ঃ না, একটা বাসা বাড়া নিয়ে থাকি। এবার আপনারটা বলুন।

ঃ আমার নাম ফাল্গুনী। বাংলায় অনার্স করছি।

ঃ আপনার চেহারার মত নামটাও খুব সুন্দর। আল্লাহপাক আপনার নামের অর্থের মত আপনাকে সৌন্দর্য দান করেছেন, ভাল নাম নিশ্চয় আছে?

ফাল্গুনী এর আগে অনেকের কাছে তার রূপের প্রশংসা শুনেছে, কিন্তু এরকম ভাবে কেউ করেনি। লজ্জায় তার মুখটা রাঙা হয়ে গেল। মৃদু হেসে বলল, আসমা বিনতে ইলিয়াস।

আরিফ সুবহান আল্লাহ বলে বলল, এক্সেলেন্ট। দুটো নামই সার্থক। ফাল্গুনী আরো বেশি লজ্জা পেয়ে বলল, আসমার অর্থটা বলুন।

ঃ অতুলনীয়।

ঃ আপনার নামের অর্থটা জানতে খুব ইচ্ছা করছে।

ঃ আমার ডাক নাম আরিফ, আরিফের দুটো অর্থ— পবিত্র ও জ্ঞানী। আর আমার আসল নাম আরিফুল্লাহ। তার অর্থ হল, আল্লাহ পবিত্র অথবা আল্লাহ জ্ঞানী। এবার আসি তাহলে?

ফাল্গুনী বলল, এই তো এলেন, এক্ষুনি চলে যাবেন?

ঃ না মানে, আপনি তো এখনো অসুস্থ। আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন।

ফাল্গুনী ভিজে গলায় বলল, আপনি থাকলেই বরং সুস্থ বোধ করব।

এমন সময় ইলিয়াস সাহেব সেখানে এসে পৌছালেন। তিনি বাসায় না গিয়ে ডাইরেক্ট এখানে এসেছেন।

ফাল্গুনী আব্বা বলে তাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। আর কোন কথা বলতে পারল না।

ইলিয়াস সাহেবেরও চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। নিজেকে কিছুক্ষণের মধ্যে সামলে নিয়ে মেয়ের মাথায় ও পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, চুপ কর মা চুপ কর। আল্লাহ পাকের কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া জানাই, তিনি তোকে সুস্থ করে দিয়েছেন। রাজশাহী অফিসের ম্যানেজারের কাছে তোর অসুখের খবর শুনে সারারাত আল্লাহর দরবারে দোওয়া চেয়েছি, "তিনি যেন তোকে হায়াতে তৈয়েবা দান করেন, তোকে সুস্থ করে দেন।"

ফাল্গুনী বাবাকে ছেড়ে দিয়ে চোখ মুখ মুছে আরিফকে দেখিয়ে বলল, পরিচয় করিয়ে দিই, ও আরিফ সাহেব, জুওলজীতে মাস্টার্স করছেন। তারপর আরিফের দিকে চেয়ে বলল, আমার আব্বা।

আরিফ আগেই বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সালাম বিনিময় করে বসতে বলল।

ইলিয়াস সাহেব বসে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কেমন আছিস?

ঃ দুপুরের পর থেকে ভাল আছি। জান আব্বা আরিফ সাহেব সাহায্য না করলে আমি বাঁচতাম কিনা জানি না। ওঁর সাহায্যেই একরকম বেঁচে গেছি।

আরিফ তাকে বাধা দিয়ে বলল, ওরকম কথা বলবেন না। বাঁচা মরা আল্লাহ্ পাকের হাত। মানুষ হিসাবে যতটুকু করার আমি করেছি।

ইলিয়াস সাহেব আরিফের সঙ্গে হাত মোসাফা করে বললেন, তবু আপনি যা করেছেন সে জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

আরিফ বলল, এবার আমি আসি। তারপর সালাম বিনিময় করে চলে যেতে উদ্যত হলে ইলিয়াস সাহেব বললেন, সময় করে বাসায় আসবেন।

জ্বী আসব বলে আরিফ ফাল্গুনীর দিকে তাকিয়ে দেখল, মিনতিভরা চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। বলল, এখন চলি ইন্‌শালাল্লাহ আবার দেখা হবে। তারপর দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে চলে এল।

আরিফ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আবসারের বাসায় গেল। খায়ের সাহেবের সঙ্গে দেখা করে চলে আসতে চাইলে আবসার বলল, সে কিরে কিছু না খেয়ে চলে যাবি?

রীমাও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আরিফ ভাই বসুন, চা-নাস্তা খেয়ে যাবেন, কথা আছে।

আরিফ আর আপত্তি করল না।

কিছুক্ষণের মধ্যে রীমা চা-নাস্তা নিয়ে এসে পরিবেশন করে, আরিফকে জিজ্ঞেস করল, আপনার সেই রুগিনীর খবর কি?

আরিফ বলল, ভাল আছেন।

ঃ তার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয়েছে নিশ্চয়?

ঃ হওয়া তো স্বাভাবিক।

আবসার বলল, হ্যাঁরে তার বাবার খবর কি?

bdeboi.com

ঃ আমি হাসপাতালে থাকতেই উনি এসেছেন।

ঃ তার সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে নিশ্চয়?

ঃ তা হয়েছে। ভদ্রলোককে বেশ ধার্মিক মনে হল।

রীমা মৃদু হেসে বলল, তাহলে তো ভালই।

আরিফ একটু অবাক হয়ে বলল, তার মানে?

ঃ মানে আবার কি? বাবা ধার্মিক হলে, মেয়েও ধার্মিক হবে। আপনার সঙ্গে বনবে ভাল।

আরিফ লজ্জা পেয়ে বলল, ভাবি যে কি!

ঃ কি আবার, সত্যি করে বলুন তো, মেয়েটা পছন্দ করার মত কিনা?

ঃ ভাবি আপনি কিন্তু অন্য সেন্সে কথা বলছেন।

আবসার বলল, তুই মেয়েটার জন্যে অনেক করেছিস। সে জন্যে তোর কাছে সে ঋণী।

আরিফ বলল, কি আর করেছি, তার জায়গায় অন্য কেউ হলেও করতাম। এটাই মানব ধর্ম। যাক এখন আসি। তারপর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল।

পরের দিন আরিফ একটা চিঠি পেল। চিঠিটা রফিক দিয়েছে। বেশ অবাক হয়ে খুলে পড়তে লাগল—

আরিফ,

আজ সাত আট বছর আমাদের দু'জনের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু ছোট বেলা থেকে আমরা দু'জনে একবৃন্তে দুটো ফুলের মত জীবন কাটিয়েছি। তোকে তোর আসল পরিচয় বলার পর থেকে তুই আমার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিলি। কারণটা জানতে

চাই না। তবে একটা অনুরোধ করছি, সে দিন তোকে যে তোর আসল পরিচয় বলেছিলাম, মনে হয় তুই তা বিশ্বাস করিস নি। কিন্তু আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি তা সব সত্য। তুই ইচ্ছা করলে এনায়েতপুরে গিয়ে তোর বড় চাচার সঙ্গে দেখা করে সত্য মিথ্যা যাঁচাই করতে পারিস। তার নাম খলিল। তোর আব্বা ব্যবসা করে অনেক বিষয়-সম্পত্তি করেছিল। সেই সব সম্পত্তি ও ব্যবসা তোর বড় চাচা ভোগ করছেন। তিনি খুব ভাল মানুষ। আমি বেশ কিছু দিন আগে তার সঙ্গে দেখা করে তোর আসল পরিচয় বলে সত্য মিথ্যা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি চোখের পানি ফেলতে ফেলতে স্বীকার করে বললেন, তোর ফুফা-ফুফির (গোফরান চাচা ও তার স্ত্রীর) কোন ছেলে মেয়ে হয়নি। তাদের অনুরোধে তিনি তোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি। তবে তার ছেলেটার আচার-ব্যবহার তেমন ভাল নয়। তোর বড় চাচা খুব কঠিন অসুখে ভুগছে। মনে হয় বেশি দিন বাঁচবে না। আমি গোফরান চাচার চাচাতো ভাইয়ের ছেলে শুনে বললেন আরিফকে মরবার আগে একবার দেখতে চাই। আর তার বাপের বিষয়-সম্পত্তিও বুঝিয়ে দিতে চাই। তাকে বলো সে যেন তাড়াতাড়ি আমাকে একবার দেখতে আসে। তুই উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছিস শুনে তোকে কত দোওয়া করলেন। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছিস, কেন এত বছর পরে তোকে চিঠি লিখলাম। আশা করি তুই তোর চাচাকে দেখা দিয়ে তার শেষ ইচ্ছা পূরণ করবি। আর বিশেষ কি লিখব।

ইতি—
রফিক

চিঠি পড়ে আরিফের মনের মধ্যে ঝড় উঠল। চিন্তা করল, হয়তো রফিক সত্যি কথাই জানিয়েছে। সিদ্ধান্ত নিল দু'একদিনের মধ্যে এনায়েতপুর যাবে। ওমরকে ডেকে বলল, আমি কাল সকালে ঢাকার বাইরে যাব। ফিরতে দু'চারদিন দেরি হতে পারে। তুমি চিন্তা করো না।

ওমর বলল, আমাকে সঙ্গে নেবেন না?

ঃ না, আমি একাই যাব।

ঃ কিন্তু আপনার আব্বা-আম্মার হুকুম.... কথাটা সে শেষ করতে পারল না। আরিফের চোখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। তার চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

আরিফ গম্ভীর স্বরে বলল, আব্বা-আম্মার মত তুমিও আমার কাছে অনেক কিছু গোপন করেছ। এবার আমি নিজেই সেই গোপনতত্ত্ব আবিষ্কার করব।

ওমর তার হাতে চিঠি দেখে ভাবল, চিঠি পড়ে হয়তো তার মন খারাপ হয়েছে। ভয়ে সে কথা জিজ্ঞেস করতে পারল না। কাঁচুমাচু হয়ে বলল, আপনি ওরকম করে চেয়ে রয়েছেন কেন? আর গোপন করার কথা কি বলছেন, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

আরিফ দৃষ্টি সংযত করে ভিজে গলায় বলল, কেউ বুঝেও না বুঝার ভান করলে তাকে বুঝান যায় না। অবশ্য এতে তোমার কোন দোষ নেই। ঠিক আছে, তুমি এখন যাও।

খোদার কি সান, ঐ দিন সন্ধের আগে গোফরান সাহেব ও সুফিয়া বেগম এসে গেলেন।

গত মাসে আরিফের পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। সুফিয়া বেগম স্বামীকে সে কথা জানিয়ে আরিফের গলায় আর একটা তাবিজ বাঁধার কথা বলে তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি আসার জন্য চিঠি দিতে বললেন।

গোফরান সাহেব বললেন, এত তাড়াহুড়া করছ কেন? ও এখন পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। তা ছাড়া নেসার ফকির তো বলেছিল, আরিফ নিজের পরিচয় জানতে চাওয়ার পর গলায় তাবিজ বাঁধতে।

সুফিয়া বেগম বললেন, তবু আমি বাঁধতে চাই আমাদের কাছ থেকে জানার আগে যদি আরিফ কারো কাছ থেকে জেনে গিয়ে আমাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করে তখন কি করবে?

গোফরান সাহেব বললেন, ঠিক আছে, আমি তাকে বাড়ি আসার জন্য চিঠি দিচ্ছি।

পনের-বিশদিন পার হয়ে যাবার পরও যখন আরিফ এল না, তখন একদিন সুফিয়া বেগম স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চিঠি পেয়েও আরিফ আসছে না কেন?

গোফরান সাহেব তখন স্ত্রীর কাছে চিঠি দেবার কথা বললেও সংসারের কাজের চাপে সে কথা একদম ভুলে গেছেন। বললেন, আরিফের আর দোষ কি? আমি তাকে চিঠি দিতে ভুলে গেছি। আজই লিখব।

সুফিয়া বেগম অভিমান করে বললেন, এ রকম ভুল করা তোমার ঠিক হয়নি। যাই হোক তোমাকে আর চিঠি লিখতে হবে না। আগামী কাল ঢাকা যাবার ব্যবস্থা কর। আমিও তোমার সঙ্গে যাব। সেখানেই তার গলায় তাবিজটা পরিয়ে দেব।

গোফরান সাহেব স্ত্রীর কথার কোন প্রতিবাদ করতে পারলেন না। তবে সংসারের কাজের কথা বলে এক সপ্তাহ পরে রওয়ানা দিলেন। সঙ্গে ওমরের বৌ আনোয়ারাকেও নিলেন।

আরিফ বাসাতেই ছিল। তাদেরকে দেখে আগের মত খুশি হতে পারল না। তবু সালাম ও কুশলাদি বিনিময় করে কদমবুসি করল।

ছেলের পরিবর্তন ওঁদের চোখ এড়াল না। সুফিয়া বেগম গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোর কি হয়েছে বাবা? তোকে যেন কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।

আরিফ গম্ভীর মুখেই বলল, কিছু একটা হয়েছে, তবে সেটা ঠিক আমি বুঝতে পারছি না।

ঃ নিশ্চয় খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমের অনিয়ম করেছিস?

ঃ না আম্মা, ওসব কিছু নয়, এখন তোমরা বিশ্রাম নাও, পরে বলব। এমন সময় মাগরিবের আযান শুনে বলল, আমি মসজিদে যাচ্ছি। তারপর সে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল।

গোফরান সাহেব ওমরকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কিছু জানিস?

ওমর বলল, ছোট সাহেব দু'দিন ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করেননি। এক রাত্রে বাসায়ও ছিলেন না। আজ একটা চিঠি এসেছে। চিঠি পড়ার পর আরিফ তাকে যা কিছু বলেছে সব বলল।

গোফরান সাহেব বললেন, ঠিক আছে, তুই আমাদের অজুর পানি দিয়ে নামাজ পড়তে যা।

মাগরিবের নামাজের পর সবাই যখন একসঙ্গে চা-নাস্তা খাচ্ছিল তখন সুফিয়া বেগম আরিফকে বললেন, এবার বলতো বাবা তোর কি হয়েছে?

আরিফ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, আমি এমন কিছু কথা জানতে পেরেছি, যেগুলো তোমরা আমার কাছে গোপন রেখেছ।

সুফিয়া বেগম ছলছল নয়নে বললেন, তুই কি আমাদেরকে অবিশ্বাস করিস?

আরিফ বলল, অবিশ্বাস করার প্রশ্নই উঠে না। আমি শুধু জানতে চাই, তোমরা আমার কাছে কিছু গোপন করেছ কি না?

সুফিয়া বেগম কিছু বলার আগে গোফরান সাহেব গম্ভীর স্বরে বললেন, আজ আমরা খুব ক্লান্ত। এ ব্যাপারে কাল তোমার সাথে কথা বলব।

আরিফ আর কোন কথা না বলে নিজের রুমে চলে গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পর সুফিয়া বেগম দুধের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে আরিফকে খাইয়ে নিজেরা জেগে রইলেন।

রাত একটার সময় গোফরান সাহেব ও সুফিয়া বেগম নেসার ফকিরের কথামত তাজিবটা আরিফের গলায় আগের তাবিজের সঙ্গে বেঁধে দিলেন।

সকালে আরিফ মসজিদ থেকে ফজরের নামাজ পড়ে এসে পড়তে বসল।

বেলা আটটার সময় ওমর এসে বলল, বেগম সাহেব আপনাকে নাস্তা খেতে ডাকছেন।

আরিফ পড়া বন্ধ করে এসে মা-বাবার সঙ্গে নাস্তা খেতে লাগল।

গোফরান সাহেব ও সুফিয়া বেগম ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলেন, গতকালের চেয়ে আজ তাকে বেশ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে।

নাস্তা খাওয়ার পর গোফরান সাহেব আরিফকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি গতকাল যে কথা জানতে চেয়েছিলে, তা এখন বলব। তুমি উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছ, ভালমন্দ বোঝার জ্ঞানও তোমার হয়েছে। যা বলব তা শুনে উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করবে। যার কাছ থেকে যা কিছু শুনে থাক না কেন, সেগুলো সব সত্য নাও হতে পারে। আমাদের কথাগুলো সত্য জানবে। তারপর তার মা-বাবা, নানা-নানী ও চাচা-চাচীর এবং যখন থেকে তাকে নিয়ে এসেছে সবকিছু বললেন। আরো বললেন, রফিকের বাবা সামসুর কুমতলবের কথা। সে তোমাকে ছোট বেলায় গলা টিপে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। সেই জন্য আমরা তোমাকে তার ছেলে রফিকের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করেছিলাম। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ, আমরা তোমার ফুফা-ফুফি? তোমার মা মারা যাবার পর তোমার নানা নেসার ফকির যে রাতে আমাদের গ্রাম থেকে তোমার নানীকে নিয়ে চলে যান, সে রাতে যাবার আগে তোমার ব্যাপারে যা-যা করতে বলেছিলেন, আমরা সে সব পালন করেছি। নিজেদের ইচ্ছামত কিছু করিনি। আমাদের কোন সন্তান নেই বলে শুধু তোমাকে ছেলে করে নিয়েছি। তুমি বড় হয়ে নিজের পরিচয় জানতে না চাওয়া পর্যন্ত তোমাকে জানাতে তোমার নানার নিষেধ ছিল। তাই এতদিন না জানিয়ে এখন জানালাম। তারপর গোফরান সাহেব চুপ করে গেলেন।

আরিফ নিজের পরিচয় শুনতে শুনতে চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছিল। গোফরান সাহেব থেমে যেতে উঠে এসে তাদেরকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমার আব্বা-আম্মাকে আল্লাহপাক দুনিয়া থেকে তুলে নিয়েছেন। তোমাদেরকেই আমি আব্বা-আম্মা বলে জানি, আর চিরকাল তাই জানব। আমাকে তোমরা দূরে সরিয়ে দিয়ো না।

সুফিয়া বেগম আরিফকে জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বললেন, এরকম কথা বলতে পারলি? দূরে সরিয়ে দেবার জন্য কি তোকে তোর সাড়ে তিন বছর বয়স থেকে লালন-পালন করে আসছি? তুই আমার পেটে না হলেও পেটের ছেলের মত তোকে মানুষ করেছি। তোকে ছাড়া আমরা বাঁচব কি করে। তোর ফুফা তার সমস্ত সম্পত্তি তোর নামে উইল করে দিয়েছে। তাই তো রফিকের আব্বা আমাদের সবার দুশমন। কিছুদিন আগে যেদিন তোর ফুফা উইল করার জন্য সিরাজগঞ্জ কোর্টে যাচ্ছিল

তখন রফিকের আব্বা গুণ্ডা লাগিয়ে তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। আল্লাহপাকের অসীম দয়ায় কিছু করতে পারেনি।

এই কথা শুনে আরিফ কান্না থামিয়ে ফুফাকে বলল, তুমি এর কোন প্রতিকার করনি?

গোফরান সাহেব বলল, আমি কোন ঝামেলায় যেতে চাইনি। আল্লাহপাকের বিচার আল্লাহপাকই করবেন। আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ক্ষমাকারীকে আল্লাহপাক খুব ভালবাসেন। এটা কোরআন-হাদিসের কথা।

ঃ কিন্তু দুষ্টের দমন করাও কোরআন-হাদিসের কথা নচেৎ তাদের সাহস আরো বেড়ে যাবে। তাদের সংখ্যা বেড়ে গেলে সমাজের অনেক ক্ষতি হবে।

ঃ তা আমি জানি। তবে অপরাধীকে ক্ষমা করে ভাল হবার সুযোগ দেওয়াও কোরআন-হাদিসের কথা। আমি সামসুর জন্য সব সময় আল্লাহপাকের কাছে দোওয়া চাই, "তিনি যেন তাকে হেদায়েৎ দান করেন। নিজের ভুল বোঝার তওফিক দেন।" আমাদের রসুল (দঃ)ও তাই করতেন।

ঃ কিন্তু রসুল (দঃ) অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোরও ছিলেন?

ঃ না, তিনি কখনও কঠোর ছিলেন না। প্রথমে অপরাধীকে ক্ষমা করে ভাল হবার সুযোগ দিতেন। তাতে সংশোধন না হলে তখন তার বিচার করে শাস্তি দিতেন।

আরিফ আর কিছু না বলে পকেট থেকে রফিকের চিঠিটা বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, গতকাল পেয়েছি।

গোফরান সাহেব পড়ে স্ত্রীকে দিলেন।

সুফিয়া বেগম পড়ে আরিফের দিকে চেয়ে বললেন, রফিক নেসার ফকিরের সম্বন্ধে কিছু জানে না। তাই তার ও আমাদের সম্বন্ধে মনগড়া কথা লিখেছে। তবে বাকি যা লিখেছে, সেসব তো আমরা তোমাকে বললাম।

আরিফ বলল, আমি আজ এনায়েতপুর যাব বলে ঠিক করেছিলাম।

সুফিয়া বেগম স্বামীর দিকে তাকালেন।

গোফরান সাহেব আরিফের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার চাচা মাসখানেক আগে মারা গেছে। তার অসুখের খবর আমরা জানতাম না। মারা যাবার খবর পেয়ে তোমার আম্মা ও আমি গিয়েছিলাম। তোমাকে গোপন করে আমরা বরাবর তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। অসুখের খবরটা কেন যে দিল না বুঝতে পারিনি। তবে মনে হয় তোমার চাচা হয়তো আমাদেরকে খবর দিতে তার ছেলে সাজ্জাদকে বলেছিল। সে দেয়নি। আমরা সে কথা জিজ্ঞেস করতে সাজ্জাদ চুপ করে ছিল। তোমার চাচা খুব ভাল লোক ছিল। কিন্তু তার ছেলে সাজ্জাদ তত ভাল নয়। সে তার মায়ের মত হয়েছে। তারা বিষয়-সম্পত্তি ও ব্যবসাপত্র যা কিছু ভোগ করছে তা প্রায় সবই তোমার বাপের। তার হাবভাবে যা বুঝলাম, সে তোমাকে তোমার বাপের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চায়। আমরা কাল এসেছি। তোমার সঙ্গে যাবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেতে পারব না। তুমি ইচ্ছা করলে ওমরকে সাথে নিয়ে একবার ঘুরে আসতে পার। তবে একটু সাবধানে থাকবে। দু' একদিনের মধ্যে ফিরে এস।

আরিফ বলল, আমি একাই যাব। আর দু'একদিনের মধ্যে ফিরে আসতে না পারলে তোমরা দুশ্চিন্তা করো না, আল্লাহপাক যেন আমাকে হেফাজত করেন সেই দোওয়া করো।

সুফিয়া বেগম আতঙ্কিত হয়ে বললেন, তোর হেফাজতের জন্য তো সব সময় দোওয়া করি। কিন্তু তোকে তারা কেউ চিনে না, এমনকি পাড়াপড়শীরাও চিনে না। তুই তো অনেক অসুবিধায় পড়বি।

আরিফ বলল, সব রকম অসুবিধা কাটিয়ে উঠার তওফিক আল্লাহপাক আমাকে দিয়েছেন। তোমরা দেখে নিয়ো, ইন্‌শাআল্লাহ আমি সহিসালামতে ফিরে আসব। আমি তো তাদের সঙ্গে ঝগড়া বা মারামারি করতে যাচ্ছি না যে, তারা আমাকে দুশমন ভেবে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে?

সুফিয়া বেগম বললেন, তোর আব্বা এখানে থাকুক, আমি তোর সঙ্গে যাব।

আরিফ বলল, তা কি করে হয়? আব্বার অসুবিধে হবে। নিজের বাড়িতে যাব। তাতে দুশ্চিন্তা করছ কেন?

সুফিয়া বেগম কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। গোফরান সাহেব তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আরিফ ঠিক কথা বলেছে। ও একাই যাক। ওর একা যাওয়া দরকার আছে বলে আমি মনে করি।

সুফিয়া বেগম স্বামীর কথার উপর কোনদিন কথা বলেননি। আজও বললেন না। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে আরিফকে বললেন, তাড়াতাড়ি ফিরবি কিন্তু।

আরিফ বলল, তাতো ফিরবই। তবে দেরি হলেও কোন চিন্তা করো না। তারপর তৈরি হয়ে আব্বা-আম্মাকে কদমবুসি ও সালাম বিনিময় করে রওয়ানা দিল।

আরিফ যখন এনায়েতপুরে গিয়ে পৌছাল তখন মাগরিবের আযান হচ্ছে। মসজিদে নামাজ পড়ে ইমাম সাহেবের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, আপনি যদি মেহেরবানী করে আমার চাচাতো ভাই সাজ্জাদকে কাউকে দিয়ে ডেকে পাঠান, তাহলে বড় উপকৃত হতাম।

ইনি সেই আগেরই ইমাম সাহেব। যিনি আরিফের আব্বা জাকিরের সবকিছু জানেন। ওঁর এখন বেশ বয়স হয়েছে। আরিফের পরিচয় পেয়ে সুবহান আল্লাহ বলে বললেন, তুমি এত বড় হয়েছ? তোমাকে সেই তিন সাড়ে তিন বছরের দেখেছিলাম। বুঝতে পারছি, তুমি আর কোনদিন এখানে আসনি। ঠিক আছে, তুমি বস, আমি ব্যবস্থা করছি। তোমার আব্বার দানেই তো মসজিদ-মাদ্রাসা চলছে। আল্লাহ তার রুহের মাগফেরাত দিক। জাকিরের মত লোক দুনিয়ায় খুব কম জন্মায়। তোমার চাচাও খুব ভাল লোক ছিলেন। এই তো মাসখানেক হল মারা গেলেন। তারপর মসজিদের খাদেমকে বললেন, সাজ্জাদকে ডেকে নিয়ে এস।

সাজ্জাদ এসে ইমাম সাহেবকে সালাম দিয়ে আরিফকে দেখিয়ে বলল, ইনাকে তো চিনতে পারছি না।

ইমাম সাহেব সালামের উত্তর দিয়ে আরিফের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সাজ্জাদ যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠে মুখটা কালো করে আরিফের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে লাগল।

আরিফ তার পরিবর্তন লক্ষ্য করে মনে মনে হাসল। তারপর বলল, তোমরা সব কেমন আছ? চাচী আম্মা ভাল আছেন?

সাজ্জাদ খুব চালাকচতুর ছেলে। ম্যাট্রিক পাস করার পর আর পড়েনি। চাষ বাস ও বাবার সঙ্গে ব্যবসা দেখাশুনা করত। বাবা মারা যাবার পর তাকেই সবকিছু দেখাশুনা করতে হচ্ছে। তার মনে হল আব্বা মারা গেছে শুনে আরিফ তার বাবার সম্পত্তি নিতে

এসেছে। সেই জন্য আরিফের পরিচয় পেয়ে মুখ কালো হয়ে গেছে। আরিফের কথা শুনে বলল, হ্যাঁ সবাই ভাল আছি।

ইমাম সাহেব বললেন, আরিফ ঢাকা থেকে এসেছে বাড়িতে নিয়ে যাও। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর।

সাজ্জাদ মনে মনে রেগে গেলেও তা প্রকাশ না করে আরিফকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে এল। তারপর মাকে খবরটা জানাল।

নিহারবানুও শুনে চমকে উঠলেন। হঠাৎ খবর না দিয়ে আরিফ আসবে তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। বললেন, তাকে কোথায় বসিয়েছিস?

সাজ্জাদ বলল, বৈঠকখানায়।

নিহারবানু বললেন, যা তাকে নিয়ে আয়। আমি ওর মায়ের রুম খুলে দিচ্ছি। সাজ্জাদ চলে যাবার পর নিহারবানু ছোট জায়ের ঘর খুলে সুইচ টিপে খুব অবাক হয়ে গেলেন। আরিফের বাবা জাকির মারা যাবার পর থেকে ঐ ঘর চাবি দেওয়া আছে। নিহারবানু নিজে ঐ ঘরে থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু থাকতে পারেননি। স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও নিহারবানু যখন একরাতে ঐ ঘরে সাজ্জাদকে নিয়ে ঘুমাতে গেলেন, কিন্তু ঘুমাতে পারেননি। চোখ বন্ধ করলেই যেন মনে হয়, সাদিয়া ঘরের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করছে। তখন এনায়েতপুরে কারেন্ট যায়নি। হারিকেন জ্বেলেই শুয়ে ছিলেন। সাদিয়া হাঁটাহাঁটি করছে মনে হলে চেয়ে দেখেছেন, কিন্তু তাকে দেখতে পাননি। শেষে ভয় পেয়ে সাজ্জাদকে নিয়ে নিজের রুমে চলে আসেন। তারপর থেকে সেই যে চাবি দিয়ে রেখেছিলেন এত বছর আর খুলেননি। আজ খুলে দেখলেন, সব কিছু পরিপাটি। এতটুকু ধুলো পর্যন্ত বিছানায় বা অন্য আসবাবপত্রে পড়েনি। আরিফের বাবার ও মায়ের কাপড়-চোপড় আলনায় যেমন গোছান ছিল, ঠিক তেমনি রয়েছে, সেগুলোতেও কোন ধুলো-বালি নেই। মনে হয় যেন একটু আগে কেউ ঘরটা ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করেছে। আগের মতই ঘর থেকে আতর গোলাপের খশবুই বেরোচ্ছে। সাজ্জাদের সঙ্গে আরিফকে আসতে দেখে দরজা থেকে পাশে সরে তার দিকে চেয়ে রইলেন। বাপের মতন আরিফের মুখের গড়ন হলেও রংটা মায়ের মত সাদা ধবধবে। এত সুন্দর ছেলে নিহারবানু আর দেখেননি। হঠাৎ তার মনে পড়ল, একেই ছোট বেলায় বিষ খাইয়ে এবং গলা টিপে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম।

সাজ্জাদ মায়ের কাছে এসে আরিফকে উদ্দেশ্য করে বলল, ইনি আমার মা।

আরিফ নিহারবানুকে কদমবুসি করে বলল, কেমন আছেন চাচী আম্মা?

নিহারবানু তার মাথায় হাত বুলিয়ে চুমো খেয়ে বললেন, বেঁচে থাক বাবা, আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুক। তুমি ভাল আছ বাবা?

আরিফ বলল, জ্বী ভাল আছি।

নিহারবানু বললেন, তোমার ফুফু-ফুফা ভাল আছে? তারা এল না কেন?

আরিফ বলল, জ্বী ভাল আছে। তারা পরে সময় করে আসবে।

নিহারবানু বললেন, তুমি যদি কিছুদিন আগে আসতে বাবা, তাহলে তোমার চাচা তোমাকে দেখে শান্তিতে মরতে পারত। মারা যাবার আগে পর্যন্ত তোমাকে দেখতে চেয়েছিল।

আরিফ বলল, সব কিছু আল্লাহ পাকের ইশারা।

নিহারবানু বললেন, এটা তোমার মা-বাবার ঘর। তুমি ভিতরে গিয়ে বস, আমি তোমার খাবার ব্যবস্থা করি। তারপর সাজ্জাদকে নিয়ে চলে গেলেন।

আরিফ ঘরের ভিতরে ঢুকে মনের মধ্যে এক ধরনের শান্তি অনুভব করল। তার মনে হল, সে যেন তার মায়ের কোলে এল। মায়ের কথা তার মনে নেই। আতর গোলাপের খশবুই পেয়ে ভাবল, এই খশবুইয়ের উৎস কোথায়? ঘরের চারপাশে তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারল না। শুনেছে তার মা পরী ছিল ভাবল পরীর সঙ্গে কি মানুষের বিয়ে হয়? আবার ভাবল, হয়তো হবে। আল্লাহ পাকের কুদরত মানুষের বোঝার অসাধ্য। পরীরা খুব সুন্দরী হয়। তাহলে তার মাও নিশ্চয় খুব সুন্দরী ছিল। এই সব ভাবতে ভাবতে এক সময় তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল।

কয়েক মাস আগে রফিক যখন এনায়েতপুরে আরিফের খোঁজ নিতে এসেছিল তখন খলিল সাহেব আরিফকে গোপনে আসার জন্য রফিককে বলেছিলেন, সে কথা নিহারবানু শুনেছিলেন। রফিক চলে যাবার পর ছেলেকে সে কথা জানিয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন, আরিফ এলে মেরে শুম করে ফেলা হবে।

সাজ্জাদ মায়ের মত কূটিল হয়েছে। সেও তাই চায়। সে জন্যে বাজারের দু'জন গুণ্ডাকে হাত করে রেখেছে।

আজ নিহারবানু আরিফকে তার মায়ের ঘরে রেখে সাজ্জাদকে নিয়ে রান্না ঘরে এসে বললেন, শত্রু হাতের মুঠোয় এসেছে। এই সুযোগ আর পাবি না। কি করে কি করবি, ঠিক করে রেখেছিস তো?

সাজ্জাদ বলল, হ্যাঁ ঠিক করে রেখেছিলাম, কিন্তু সে প্ল্যানে করা যাবে না। আরিফ যে এসেছে তা মসজিদের ইমাম ও খাদেম জানে। তাই ভেবেছি, এখানে কিছু করা ঠিক হবে না। মনে হয়, এসেছে যখন তখন হয়তো দু'চারদিন থাকবে। এর মধ্যে বাইরে নিয়ে গিয়ে কাজটা করতে হবে। আমরা সেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকবো।

নিহারবানু বললেন, যা কিছু করবি, খুব সাবধানে করবি। আর শোন, আরিফের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে। সে তোর ছোট হলেও তোর চেয়ে অনেক বেশি লেখাপড়া করেছে। তুই-তোকারি করে কথা বলবি না। মোট কথা এমন ব্যবহার দেখাতে হবে সে যেন বুঝতে না পারে তার প্রতি আমরা অসন্তুষ্ট। একটা কথা মনে রাখবি, সে এখানকার প্রায় সবকিছুর এখন মালিক। তোর আব্বার আর কতটুকু আছে।

সাজ্জাদ বলল, তোমাকে আর বেশি কিছু বলতে হবে না। যা যা বললে সেই মত করব।

সে রাতে আরিফ ঘুমাতে পারল না। সারারাত নফল নামাজ ও কোরান তেলাওয়াত করে আব্বা-আম্মার রুহের মাগফেরাতের জন্য দোওয়া চাইল।

পরের দিন সাজ্জাদ আরিফকে তার বিষয় সম্পত্তি ও ব্যবসাপত্র দেখিয়ে বেড়াল। ধান চাল ও পাটের আড়তের কর্মচারীরা আরিফের পরিচয় পেয়ে খুব আনন্দিত।

আরিফ প্রথম দিন সাজ্জাদের সঙ্গে পরিচয় হবার সময় তার মুখের দিকে চেয়ে যা বুঝতে পেরেছিল, পরের দিন সকাল থেকে তার বিপরীত দেখে বিপদের গন্ধ পেল। তার মনে হল, এত খাতির-যত্নের পিছনে নিশ্চয় কোন কুমতলব আছে। তখন তার আব্বার কথা মনে পড়ল, "খুব সাবধানে থাকবে।" এখানে এসে কি করবে, তা সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছে। তাই পরের দিন আব্বার কবর জিয়ারত করল। তার পর গ্রামের সবার সঙ্গে পরিচিত হতে লাগল। দু'তিন দিন পর উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য কাউকে কিছু না বলে সিরাজগঞ্জ কোর্টে গেল। সানোয়ার একজন নামকরা উকিল। আরিফ লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করে তার কাছে গিয়ে নিজের ইচ্ছার কথা বলল।

সানোয়ার উকিলের বাড়ি এনায়েতপুরে। টাউনে বাড়ি করে ফ্যামিলী নিয়ে থাকেন। তিনি আরিফের বাপ-চাচাদের চিনেন। গোফরান সাহেবকেও চিনেন। আরিফের কথা শুনে বললেন, আপনি জাকিরের উপযুক্ত সন্তান। আপনার নানা-নানী ও মায়ের সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তি আছে। আপনি কি সেসব জানেন?

আরিফ বলল, কিছু কিছু জানি। ওসব কথা থাক। আমি আপনাকে যা কিছু বললাম, সেগুলো একটু তাড়াতাড়ি করবেন। আমাকে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ঢাকায় ফিরতে হবে। সামনে আমার পরীক্ষা। আর শুনুন। একথা আপনি কাউকে জানাবেন না।

সানোয়ার উকিল বললেন, আপনি চিন্তা করবেন না আমি সবকিছু তৈরি করে আপনাকে খবর দেব। আপনি এসে রেজিস্ট্রি করে দেবেন। দু'একদিনের মধ্যে পারতাম, কিন্তু আপনি তো কোন দলিলপত্র দিতে পারছেন না। তাই সেগুলো কোর্ট থেকে তুলতে সময় লাগবে।

আরিফ তাকে বেশ কিছু টাকা দিয়ে ফিরে এল।

সাজ্জাদ যে দু'জন গুণ্ডাকে ঠিক করেছিল তাদের নাম খালেক ও মালেক। আরিফ আসার পরের দিন গুণ্ডা দু'জনকে তাকে চিনিয়ে দিয়ে বলেছিল, আরিফ একা গ্রামের বাইরে কোথাও গেলে সুযোগ মত মেরে গুম করে দিবি। তারপর দশ হাজার টাকা দিয়ে বলল, অর্ধেক দিলাম বাকিটা কাজ হাসিল করার পর পাবি। কিন্তু খুব সাবধান, কেউ যেন টের না পায়। সেই থেকে তারা আরিফকে চোখে চোখে রেখেছে।

আজ আরিফ যখন সিরাজগঞ্জ কোর্টে যায় তখন তারাও পিছু নেয়। ফেরার সময়ও তার সঙ্গে ছিল। কিন্তু মার্ডার করার কোন সুযোগ পেল না। আরিফের ফিরতে বিকেল হয়ে গেল।

নিহারবানু অনুযোগসুরে বললেন, সারাদিন না খেয়ে কোথায় ছিলে বাবা? খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত না করলে অসুখ-বিসুখ করবে। তখন তো সুফিয়া বুবু ও গোফরান ভাই আমাকে দোষ দিবে।

আরিফ বলল, সিরাজগঞ্জে একটা কাজে গিয়েছিলাম।

নিহারবানু বললেন, সে কথা বলে যেতে পারতে বাবা। দিনকাল ভাল নয়, সাজ্জাদ না হয় তোমার সাথে যেত। আর কোন দিন একা একা কোথাও যেও না। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে এস, খেতে দেব। সাজ্জাদ তোমার জন্য অপেক্ষা করে এই কিছুক্ষণ আগে খেয়ে আড়তে গেল।

আরিফ খেয়ে উঠে বাবা মাকে চিঠি লিখে জানাল, তার ফিরতে হয়তো দশবার দিন দেরি হবে। সে জন্য কোনরকম দুশ্চিন্তা যেন না করে।

এদিকে সুফিয়া বেগম আরিফের ফিরতে দেরি দেখে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। স্বামীকে বললেন, আমরাও যাই চল।

গোফরান সাহেব বললেন, আরিফ তো বলে গেল, ফিরতে দেরি হলে আমরা যেন চিন্তা না করি।

কিন্তু আমার মনে বোধ নিচ্ছে না। কেবলই মনে হচ্ছে, সে কোন বিপদে পড়েছে। আমাকে না হয় বাড়িতে রেখে তুমি এনায়েতপুরে যাবে।

ঃ তুমি মা, মায়েরা সন্তানের বিপদের কথা বেশি ভাবে। আমি বাপ আমরাও ভাবি; তবে বাপেরা মায়েদের মত অত উতলা হয় না। আরিফ এক সপ্তাহের কথা বলে গেছে, আরো দু'একদিন দেখব; এর মধ্যে না ফিরলে তুমি যা বললে তাই করব।

আরিফ যাবার দু'তিন দিন পর আবসার তার খোঁজে এল।

গোফরান সাহেব ও সুফিয়া বেগম তাকে চেনেন। আপ্যায়ন করবার পর বললেন, আরিফ দেশের বাড়ি গেছে, সপ্তাহ খানেক পরে ফিরবে।

আবসার কয়েক দিন পরে আসবে বলে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রিক্সা করে ফিরে আসছিল। নিউ এলিফেন্ট রোডের জুতোর দোকানগুলোর সামনে থেকে আসার সময় রীমার কথা মনে পড়ল। সে কয়েক দিন থেকে এক জোড়া স্যান্ডেল কেনার কথা বলছে, ঘোড়ার ডিম মনেই থাকে না। রিক্সাওয়ালাকে বলল, এই ভাই দাঁড়াও তো। রিক্সাওয়ালা রিক্সা থামাবার পর বলল, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি একজোড়া স্যান্ডেল কিনব। অবশ্য, এর জন্য ভাড়া বেশি দেব।

রিক্সাওয়ালা বলল, একটু তাড়াতাড়ি করবেন সাহেব।

আবসার একটা দোকানে ঢুকে দেখল সেখানে কয়েক জন যুবতী জুতো কিনছে। সে একজন সেলস্‌ম্যানকে একজোড়া লেডিস স্যান্ডেল দেখাতে বলল।

ততক্ষণে যুবতীরা জুতো কিনে বেরোতে যাবে এমন সময় তাদের মধ্যে একজন আবসারের দিকে চেয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে মহাখালী কলেরা হাসপাতালে দেখেছিলাম। আপনি আরিফ সাহেবের বন্ধু না?

আবসার প্রথমে তাকে চিনতে পারল না। কারণ আজ তার মাথায় কালো রুমাল বাঁধা। গায়ে কালো রংয়ের বড় চাদর জড়ানো। তার দিকে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থেকে চিনতে পেরে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, হ্যাঁ আপনি ঠিক বলেছেন।

ঃ আমি বাইরে অপেক্ষা করছি, আপনি কাজ সেরে আসুন, কথা আছে।

আবসার জুতো কিনে দোকানের বাইরে এলে সেই যুবতীটি বলল, আরিফ সাহেবের ঠিকানাটা দেবেন?

আবসার একটা কাগজে ঠিকানা লিখে তার হাতে দিয়ে বলল, আমি এখন তার বাসা থেকে ফিরছি। সে দেশের বাড়িতে গেছে। সপ্তাহ খানেক পরে ফিরবে।

যুবতীটি ধন্যবাদ জানিয়ে সাথীদের নিয়ে চলে গেল।

ঐ যুবতীটি ফাল্গুনী। সে তিন দিনের দিন সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আসে।

ফাল্গুনী যখন আরিফের সাহায্য করার কথা সব তার বাবাকে বলে তখন ইলিয়াস সাহেব বললেন, ছেলেটাকে আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি, খুব বনেদী ঘরের।

তুই তার ঠিকানা জানিস?

ফাল্গুনী বলল, তার নাম আরিফ, দেশের বাড়ি সিরাজগঞ্জের সমেশপুর গ্রামে। ভার্সিটিতে জুওলজিতে মাস্টার্স করছে। কিন্তু ঢাকার ঠিকানা জানার সময় পেলাম না। আজ ঠিকানা পেয়ে বাসায় এসে আব্বাকে বলল, আরিফ সাহেবের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েছি।

ইলিয়াস সাহেব বললেন, ঠিক আছে আমাকে মনে করিয়ে দিস, কয়েকদিন পরে না হয় যাওয়া যাবে।

সাত আট দিন পর ফাল্গুনী আব্বাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন বিকেলে আরিফের বাসায় গেল।

কলিংবেলের শব্দ পেয়ে গোফরান সাহেব ওমরকে বললেন, দেখ তো কে এল। ওমর দরজা খুলে আগন্তুকদের চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, কাকে চান?

ইলিয়াস সাহেব বললেন, এখানে আরিফ সাহেব থাকেন?

ঃ জ্বী থাকেন।

ঃ তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ঃ কিন্তু ছোট সাহেব তো এখনো দেশের বাড়ি থেকে ফেরেন নি।

ঃ বাসায় আর কে কে আছেন?

ঃ বড় সাহেব ও বেগম সাহেব আছেন।

ঃ আমরা তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ওমর কারো সঙ্গে কথা বলছে বুঝতে পেরে গোফরান সাহেব ভিতর থেকে বললেন, ওমর কে এসেছে রে?

ওমর বলল, একজন সাহেব আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান। সঙ্গে একজন মেয়েও আছে।

গোফরান সাহেব বললেন, ঠিক আছে ওঁদেরকে ড্রইংরুমে বসা, আমি আসছি।

ওমর আগন্তুকদের বলল, আপনারা ভিতরে এসে বসুন। তারপর ইলিয়াস সাহেব ও ফাল্গুনীকে ড্রইংরুমে এনে বসতে বলে ভিতরে চলে গেল।

একটু পরে গোফরান সাহেব ড্রইংরুমে এসে সালাম দিয়ে বসে বললেন, আপনাদের তো চিনতে পারলাম না।

ইলিয়াস সাহেব সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, আমরা তো পরিচিত লোক নই যে চিনবেন। আপনার ছেলের সঙ্গেও আমাদের তেমন পরিচয় নেই। কিন্তু তিনি আমাদের যা উপকার করেছেন, তা কোন দিন ভুলতে পারবো না। তাই আপনাদের সবার সঙ্গে পরিচিত হতে এলাম।

গোফরান সাহেব মৃদু হেসে বললেন, ছেলেটার স্বভাবই ঐরকম, তা আপনাদের কি এমন উপকার করেছে?

ইলিয়াস সাহেব মেয়েকে দেখিয়ে বললেন, এ আমার একমাত্র সন্তান। কয়েকদিন আগে এর কলেরার মত হয়েছিল। আমি সে সময় রাজশাহী গিয়েছিলাম। তারপর আরিফ দু'দিন কিভাবে তার মেয়েকে সাহায্য করেছিল, সে সব বলে বললেন, ঐ দিন আপনার ছেলে সাহায্য না করলে আমার মেয়ে হয়তো মারাই যেত। তিনি আমাকে টেলিফোন করে খবরটা দেন। আমি আসার পর পর হাসপাতাল থেকে চলে আসেন। পরিচয় নেবার সময়টুকু পর্যন্ত আমাকে দেননি।

গোফরান সাহেব বললেন, সে তো নেই। কয়েকদিন আগে দেশের বাড়ীতে গেছে। তাড়াতাড়ি ফেরার কথা ছিল। আজই তার চিঠি পেলাম, লিখেছে ফিরতে আরো কয়েক দিন দেরি হবে। ইলিয়াস সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে ফাল্গুনীর অপূর্ব রূপলাবণ্য দেখে গোফরান সাহেব খুব অবাক হলেন। তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি মা?

ঃ আসমা বিনতে ইলিয়াস, ডাক নাম ফাল্গুনী।

ঃ সুবহান আল্লাহ, দু'টো নামই খুব সুন্দর।

ঃ নিশ্চয় পড়াশুনা করছ?

ঃ জ্বী বাংলায় অনার্স করছি।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ।

এমন সময় ওমর দু'জনের নাস্তা নিয়ে এসে টেবিলের উপর রেখে ফাল্গুনীর দিকে চেয়ে বলল, উনাকে বেগম সাহেব ভিতরে যেতে বলেছেন।

সুফিয়া বেগম স্বামীর সঙ্গে এসে দরজার পর্দা ফাঁক করে তাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। ফাল্গুনীকে দেখে উনিও খুব অবাক হয়েছেন। তাই তাকে ভিতরে ডেকে পাঠিয়েছেন।

ওমরের কথা শুনে বাপ-বেটিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে দেখে গোফরান সাহেবের মুখে হাসি ফুটে উঠল। ফাল্গুনীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যাও মা ভিতরে যাও, আরিফের আম্মা তোমাকে ডাকছে।

মেয়েকে ইতস্তত করতে দেখে ইলিয়াস সাহেব বললেন, বসে আছিস কেন যা।

ফাল্গুনী ওমরের সাথে পর্দা ঠেলে পাশের রুমে ঢুকে দেখল, একজন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তার মনে হলো ইনিই আরিফ সাহেবের মা। সালাম দিয়ে কদমবুসি করতে গেলে সুফিয়া বেগম সালামের উত্তর দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, থাক মা থাক, কদমবুসি করতে হবে না। তারপর দোওয়া করে আনোয়ারাকে নাস্তা নিয়ে আসতে বলে ফাল্গুনীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সঙ্গে কি আরিফের আগের থেকে পরিচয় ছিল?

ঃ জ্বী না, আমাকে আমাদের কাজের মেয়ে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, তার মুখে শুনেছি আরিফ সাহেব আগের থেকে হাসপাতালের গেটের কাছে ছিলেন।

ঃ তোমার আম্মা নেই?

ঃ জ্বী না, আমার বয়স যখন দশ বছর তখন আম্মা মারা যান।

ঃ তোমাদের দেশের বাড়ি কোথায়?

ঃ রাজশাহী।

ততক্ষণে ফাল্গুনীর খাওয়া শেষ হয়েছে। বলল, এবার আসি খালা আম্মা।

সুফিয়া বেগম ফাল্গুনীর চিবুক ধরে তার দু'গালে চুমো খেয়ে বললেন, আমার মেয়ে নেই, তোমারও মা নেই। আজ থেকে তুমি আমার মেয়ে। যখনই ইচ্ছা হবে মাকে দেখতে চলে আসবে।

সুফিয়া বেগমের আদর-সোহাগে ফাল্গুনীর চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল, তখন তার নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। মা তাকে কত ভালবাসত। যখন মা মারা যায় তখন তার বয়স দশ বছর হলেও মায়ের মুখের ছবি বেশ মনে আছে।

তার চোখে পানি দেখে সুফিয়া বেগম জড়িয়ে ধরে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, মায়ের কথা মনে পড়ছে বুঝি? বললাম না, আজ থেকে তুমি আমাকে মা বলে ডাকবে?

ফাল্গুনী কদমবুসি করে ভিজে গলায় বলল, আপনি দেখতে অনেকটা আমার মায়ের মত। তাই আপনাকে দেখে মায়ের কথা মনে পড়ছে।

সুফিয়া বেগম বললেন, ও মা তাই নাকি! তাহলে তো আমি তোমার মা হয়েই গেলাম।

ফাল্গুনী বলল, হ্যাঁ, আজ থেকে আপনাকে আমি আম্মা বলে ডাকব।

সুফিয়া বেগম আনোয়ারাকে বললেন, যা তো, আরিফের আব্বাকে ডেকে নিয়ে আয়।

আনোয়ারা ড্রইংরুমে এসে গোফরান সাহেবকে বললেন, বেগম সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

গোফরান সাহেব ইলিয়াস সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না, এক্ষুনি আসছি। তারপর পাশের রুমে গেলেন।

স্বামীকে দেখে সুফিয়া বেগম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমাদের তো কোন মেয়ে নেই। তাই ফাল্গুনীকে আমি মেয়ে করে নিয়েছি। ফাল্গুনীও আমাকে মা ডেকেছে। তুমি কি একে মেয়ে হিসাবে গ্রহণ করবে?

গোফরান সাহেব আলহামদুলিল্লাহ বলে বললেন, এমন মেয়েকে মেয়ে হিসাবে পাওয়া তো সৌভাগ্যের কথা।

ফাল্গুনী গোফরান সাহেবকেও কদমবুসি করে বলল, আপনাদের মেয়ে হতে পেরেছি সেটাও আমার কম সৌভাগ্য নয়। আপনারা আমাদের বাসায় যাবেন।

গোফরান সাহেব বললেন, নিশ্চয় যাব মা। তারপর তাকে সঙ্গে করে ড্রইংরুমে এসে ইলিয়াস সাহেবকে বললেন, আজ থেকে ফাল্গুনী শুধু আপনার একার মেয়ে নয়, আমাদেরও মেয়ে। আমার ওয়াইফ একে মেয়ে করে নিয়েছে।

ইলিয়াস সাহেব ইঙ্গিতটা যেন একটু বুঝতে পারলেন। শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলে বললেন, এ তো খুব ভাল কথা। আমার মেয়ের সৌভাগ্য আপনাদের মত পুণ্যবান ও পুণ্যবতীর মনে ধরেছে। আমি আপনাদের ছেলেকে মাত্র কয়েক মিনিট দেখেছি এবং তার সঙ্গে দু'একটা কথা বলেছি। তাতেই আল্লাহপাক আমার মনে যে আশার সঞ্চার করিয়েছেন, তা পূরণ হবার সম্ভাবনা হতে পারে ভেবে আবার সেই করুণাময়ের দরবারে শতশত শুকরিয়া জানাচ্ছি। আপনার ওয়াইফকে আমার সালাম জানিয়ে বলবেন, ফাল্গুনীকে মেয়ে করে নিয়েছেন জেনে আমি খুব খুশি হয়েছি। আজ তাহলে উঠি ভাই সাহেব বলে দাঁড়িয়ে একটা ভিজিটিং কার্ড গোফরান সাহেবের হাতে দিয়ে বললেন, আরিফ ফেরার পর তাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাসায় এলে খুশি হব।

গোফরান সাহেব বললেন, আমাদেরকে অত বড় করে বলবেন না। আমরা গ্রামের সাধারণ মানুষদের একজন। আর যাবার কথা যে বলছেন, ইন্‌শাআল্লাহ নিশ্চয় যাব। তবে আরিফের ব্যাপারে সিওর কিছু বলতে পারছি না। জানেন তো, ছেলে-মেয়েরা বড় হলে নিজস্ব মতামতে কাজ করে।

ইলিয়াস সাহেব বললেন, তা নিশ্চয় জানি। তবে আমি কিন্তু সিওর, আরিফ বাবা মার কথা কখনো অবহেলা করে না।

গোফরান সাহেব বেশ একটু অবাক হয়ে বললেন, আরিফকে তো আপনি মাত্র কয়েক মিনিট দেখেছেন, এমন কি তার সঙ্গে ভাল করে কথাবার্তাও বলেননি, তবু তার এবং আমাদের সম্বন্ধে এ রকম কথা বললেন কি করে?

ইলিয়াস সাহেব মৃদু হেসে বললেন, এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। ফাল্গুনীকে দেখিয়ে বললেন, যা কিছু ওরই। ঐ তো আমাকে আরিফের সম্বন্ধে যা কিছু বলার বলেছে।

গোফরান সাহেব আরো একটু বেশি অবাক হয়ে বললেন, কিন্তু আপনি তো বললেন, আপনার মেয়ের সঙ্গেও আরিফের বেশি কথাবার্তা হয়নি?

ইলিয়াস সাহেব বললেন, আমার মেয়ের আল্লাহ প্রদত্ত এমন কিছু ক্ষমতা আছে যার ফলে সে ছোটবেলা থেকে যা কিছু বলে তা সত্য হয়।

কথাটা শুনে গোফরান সাহেব চমকে উঠলেন, চিন্তা করলেন, আরিফের মায়ের মত এই মেয়ের মাও কি পরীর মেয়ে?

ইলিয়াস সাহেব গোফরান সাহেবের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। বললেন, আমার কথা শুনে আপনি যেন কিছু চিন্তা করছেন?

গোফরান সাহেব বললেন, হ্যাঁ-না, মানে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবেন না। আপনার ওয়াইফও কি এই রকম কথা বলতেন?

ইলিয়াস সাহেব কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সে আরো বেশি বলত, তারপর মেয়েকে বললেন, চল মা এবার ফিরি।

ফাল্গুনী সবাইর কথায় খুব লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে ছিল। আব্বার কথা শুনে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, হ্যাঁ আব্বা চল।

ইলিয়াস সাহেব আর একবার বাসায় যাবার কথা বলে সালাম বিনিময় করে মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন।

গোফরান সাহেব তাদেরকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন।

ওরা বেরিয়ে যাবার পর সুফিয়া বেগম ড্রইংরুমে এসে বসেছিলেন। স্বামী ফিরে এলে বললেন, ফাল্গুনীকে আরিফের সঙ্গে দারুণ মানাবে।

গোফরান সাহেব তার পাশে বসে বললেন, আমিও তোমার সঙ্গে একমত। কিন্তু আরিফের মতামত না জানা পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না।

সুফিয়া বেগম বললেন, আমার মনে হয়, আরিফ অমত করবে না।

গোফরান সাহেব বললেন, আমারও তাই মনে হয়।

bdeboi.com

পাঁচ

এদিকে সাজ্জাদ মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে মত পাল্টাল। ঠিক করল, এখানে আরিফকে মার্ডার না করে ঢাকায় করবে। কারণ গ্রামে বা গ্রামের বাইরে হলেও সবাই মনে করবে চাচাতো ভাই সাজ্জাদ এই কাজ করিয়েছে। আর ঢাকায় হলে কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারবে না। এই সিদ্ধান্ত নেবার পর সাজ্জাদ গুণ্ডা দু'জনকে সব কিছু বুঝিয়ে বলে ঢাকায় মার্ডার করার কথা বলল। আরো বলল, তাহলে তোমাদেরকে কেউ সন্দেহ করবে না। সবাই জানবে, শহরে দুষ্কৃতকারীদের হাতে আরিফ মারা গেছে।

সাজ্জাদের কথামত গুণ্ডারা আরিফকে ফলো রাখল।

আরিফ সপ্তাহ খানেক পরে সানোয়ার উকিলের কাছে গিয়ে বলল, কতদূর কি করলেন?

সানোয়ার উকিল বললেন, কাগজপত্র এখনো সব জোগাড় করতে পারিনি। আপনি কয়েক দিন পরে আসুন।

আরিফ তাকে তাড়াতাড়ি করার জন্য তাগিদ দিয়ে ফিরে এল। চার পাঁচ দিন পর আবার সানোয়ার উকিলের কাছে গেল।

সানোয়ার উকিল বললেন, সাজ্জাদ খুব চালাক ছেলে। বাপ মারা যেতে না যেতে সেটেলমেন্ট অফিসে গিয়ে চাচা নিঃসন্তান জানিয়ে সব সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়েছে। কোর্ট থেকে সব কিছু নিজের নামে করার ব্যবস্থা করেছে।

আরিফ বলল, তাহলে তো কাজ সমাপ্ত করতে বেশ দেরি হবে?

সানোয়ার উকিল বললেন, হ্যাঁ তা হবে।

আরিফ তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলল, এগুলো রাখুন। সবকিছু রেডী করে চিঠি দিয়ে জানাবেন। আমি আসব। তারপর সালাম বিনিময় করে বিদায় নিয়ে ফিরে এল।

সেদিন রাতে আরিফ নিহারবানুকে বলল, চাচী আম্মা, আমি কাল সকালে ঢাকা চলে যাব।

নিহারবানুর মনে যাই থাকুক না কেন, এই কয়েক দিন আরিফের বেশ আদর-যত্ন করেছেন। এখন তার কথা শুনে বললেন, আরো কয়েকদিন থাক না বাবা।

আরিফ বলল, না চাচী-আম্মা থাকতে পারব না। পড়াশুনার ক্ষতি হবে।

পরের দিন সকালে আরিফ চলে যাবার পর সাজ্জাদ মাকে বলল, আরিফ খুব চালাক। আমাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস না করে বাপের সম্পত্তির কাগজপত্র কোর্ট থেকে তোলার জন্য সিরাজগঞ্জে গিয়ে সানোয়ার উকিলকে ধরেছে। আমিও দেখব কেমন করে সে বাপের সম্পত্তি নিতে পারে।

নিহারবানু বললেন, তোর ফুফা-ফুফি তার পিছনে আছে। তাছাড়া গ্রামের লোকেরাও সব কিছু জানে।

সাজ্জাদ বলল, সেইজন্যেই তো ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি।

আরিফ এনায়েতপুরে আসার দু'দিন পর থেকে বুঝতে পেরেছিল, তাকে দু'জন লোক সব সময় ফলো করে। তাই যে কয়েকদিন সেখানে ছিল, সব সময় সচেতন ছিল। আগেই ভেবে রেখেছে, প্রথমে সমেশপুরে গিয়ে মায়ের কবর জিয়ারত করবে তারপর ঢাকায় ফিরবে। এনায়েতপুর থেকে সিরাজগঞ্জে আসার সময় বাসে সেই দু'জন লোককে দেখে ভাবল, এদেরকে উচিত মত শিক্ষা দিতে হবে। সমেশপুরে বাস থেকে নেমে রাস্তার পাশের টিউবঅয়েল থেকে অজু করে মায়ের কবর জিয়ারত করার জন্য কবরস্থানের দিকে রওয়ানা হল, মায়ের কবরের কাছে এসে প্রথমে সালাম দিল— আসসালামু আলায়কুম ইয়া আহলাল কুবুরে মিনাল মোসলেমিনা, ওয়াল মো'মেনীনা, আন্তমলানা সালাফেও ওয়া নাহনু লাকুম তাবাওঁও ওয়া ইন্না ইন্‌শায়াল্লাহু বেকুম লা-হেক্কুনা, ইয়ার হামুল্লাহুল মুশতাকদেমীনা, মিন্না ওয়াল মোস্তামেরীনা, নাশয়ালুল্লাহ লানা ওয়ালাকুম, ওয়া ইয়ারহামুনাল্লাহ ওয়া ইয়াকুম, আমীন, তারপর উনিশ বার বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, একবার সূরা তাকাসুর, একবার সূরা কোরাইশ, তিনবার সূরা এখলাস, একবার সূরা ফালাক্ব, একবার সূরা নাস, একবার আয়তুল কুরসি, দশবার আসতাগফেরুল্লাহ ও অন্যান্য কিছু সূরা ক্বেরাত এবং এগারবার দরুদ শরীফ পাঠ করে মায়ের রুহের উপর বখশে দিয়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে অনেক কিছু বলে মোনাজাত করতে লাগল।

খালেক ও মালেক আরিফকে ফলো করে আসার সময় পরামর্শ করল, এখানে মেরে ফেলে রেখে গেলে কেউ আমাদেরকে সন্দেহ করতে পারবে না। তবে গুলি করে মারা ঠিক হবে না। কারণ গুলির শব্দ শুনে কেউ যদি এদিকে লক্ষ্য রাখে, তাহলে আমাদের দেখে ফেলতে পারে। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিল, ড্যাগার দিয়ে কাজ সারবে। তবে দরকার হলে গুলিও করবে। জঙ্গলের ভিতর আরিফকে ঢুকতে দেখে প্রথমে তারা বেশ অবাক হলেও নিরাপদে কাজ সারতে পারবে ভেবে মনে মনে খুশি হল। তারপর এই জঙ্গলের ভিতর কবর ও আরিফের কার্যকলাপ দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে বলাবলি করল, কবরটা কত সুন্দর। নিশ্চয় ওর আপনজনের। তারা আরিফের অনতিদূরে পাশাপাশি দু'টো গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে যুক্তি করল, আরিফ যখন ফিরবে তখন দু'জনে একসঙ্গে পিছন থেকে আক্রমণ করে শেষ করে দেবে।

আরিফ মোনাজাত শেষ করে কবরের দক্ষিণ দিকে বসে পড়ে কবরে মুখ ঠেকিয়ে কয়েক বার চুমু খেল, তারপর ফিরে আসতে লাগল। সে যখন অজু করে কবরস্থানের দিকে রওয়ানা দেয় তখন তার মনে মায়ের কথা ভেসে উঠে। ফলে গুণ্ডা দু'জনের কথা ভুলে যায়। কবর জিয়ারত করে ফেরার সময় হঠাৎ তাদের কথা মনে পড়তে চিন্তা করল, তারা নিশ্চয় আমাকে ফলো করে এখানে এসেছে। তাই চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি

রেখে ফিরে আসতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে সে খালেক ও মালেক যেখানে লুকিয়েছিল, সেখান থেকে কিছুটা এগিয়ে এসেছে।

খালেক ও মালেক পা টিপে টিপে এসে পিছন থেকে আরিফকে ড্যাগার মারার জন্য হাত তুলল, কিন্তু তারা হাত আর নামাতে পারল না। তাদের মনে হল, কেউ যেন তাদের হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। আরিফ যখন বেশ কিছুটা দূরে চলে গেল তখন তারা হাত নামাতে পারল। খুব অবাক হয়ে একজন অপরজনকে বলল, কি ব্যাপার বল তো, কেউ যেন এতক্ষণ আমার হাত ধরে রেখেছিল। অপরজন বলল, আমারও তাই। তারা তখন গুলি করে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে দু'জন দু'টো পিস্তল বের করে গুলি করতে যাবে এমন সময় দেখল আরিফ ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চেয়ে আছে।

আরিফ তাদের কথা বলার চাপা শব্দ শুনতে পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। খালেক ও মালেক তার বুক লক্ষ্য করে ফায়ার করল। আরিফের বুকে যে দু'টো তাবিজ ছিল গুলি সেগুলোর উপর লাগল। আরিফ গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু বুঝতে পারল, তার কোন ক্ষতি হয়নি। হঠাৎ তার মনে হল নানার তাবিজের গুণে আল্লাহ পাক বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তাবিজ দু'টোতে চুমো খেয়ে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করল। তারপর ক্রল করে লোক দু'টোর পিছন দিকে যেতে লাগল।

বন জঙ্গল থাকায় গুণ্ডা দু'টো বুঝতে না পেরে পিস্তল বাগিয়ে সেই দিকে এগিয়ে এল! তারপর দু'জনে গাছটার গোড়া লক্ষ্য করে আবার গুলি করল।

ঠিক সেই সময় আরিফ পেছন থেকে দু'হাত দিয়ে তাদের দু'জনের ঘাড়ে ক্যারাতের চাপ মারল।

এরকম মারের সঙ্গে গুন্ডা দু'জনের পরিচয় ছিল না। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠে বসে পড়ে চোখে ধোঁয়া দেখতে লাগল।

সেই সুযোগে আরিফ দু'হাতে দু'জনের পিস্তল ধরা হাতের বাজুতে আবার আঘাত করতে, তাদের হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেল। আরিফ দু'জনের ঘাড়ে আরো কতকগুলো ক্যারাতের চাপ মেরে অজ্ঞান করে ফেলল। তারপর জঙ্গলী লতা দিয়ে তাদের দু'জনের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে জ্ঞান ফেরার অপেক্ষা করতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে তাদেরকে চোখ খুলতে দেখে দু'জনের দিকে দু'টো পিস্তল বাগিয়ে ধরে বলল, বল, তোদেকে কে এই কাজের জন্য পাঠিয়েছে?

খালেক ও মালেক জ্ঞান ফিরে পেয়ে আরিফের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে চিন্তা করতে লাগল এর গায়ে এত শক্তি এলো কি করে? আর এ রকম মারের কায়দাই বা জানল কেমন করে? তখন আমাদের ড্যাগারসহ হাত কে ধরে রেখেছিল? বুকে দু'টো গুলি খেয়েও বেঁচে গেল কি করে? এই সব চিন্তা করে তারা খুব ভয় পেয়ে কাঁপতে লাগল।

তাদের অবস্থা দেখে আরিফ গর্জে উঠে বলল, মনে করেছিলে এই নির্জন জায়গায় আমাকে মেরে রেখে গেলে কেউ টের পাবে না। এখন তোমাদেরকে যদি আমি এখানে মেরে রেখে যাই, তাহলে কেমন হবে? আমার কথার জবাব দাও, নচেৎ দু'জনকেই গুলি করে শেষ করে দেব।

তারা আরিফের কথা শুনে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, আমরা গরিব মানুষ। মারা গেলে আমাদের বৌ-ছেলে-মেয়েরা না খেয়ে মারা যাবে। আপনি দয়া করুন সাহেব। আমাদেরকে সাজ্জাদ সাহেব টাকা দিয়ে এই কাজ করতে বলেছেন। আমাদেরকে মাফ করে দিন।

আরিফ বলল, আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মেরে ফেলতে পারি; কিন্তু তা করব না। এখন তোমাদের বাঁচার দু'টো পথ বলছি, যেটা ইচ্ছা তোমরা বেছে নিতে পার। প্রথমটা হল, পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া; আর দ্বিতীয়টা হল, তোমরা যদি আমার

হাতে হাত রেখে আল্লাহ্ পাকের কাছে তওবা করে ওয়াদা কর, জীবনে কোন দিন কোন অন্যায় কাজ করবে না, তাহলে তোমাদেরকে ছেড়ে দেব।

খালেক ও মালেক আরিফের পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলল, আমরা আপনার পায়ে মাথা রেখে তওবা করছি। এবং ওয়াদা করছি, জীবনে আর কোন দিন কোন অন্যায় কাজ করে টাকা রোজগার করব না। আপনি আমাদেরকে মাফ করে দিন সাহেব। আমাদেরকে পুলিশের হাতে দেবেন না। তারপর তারা আরিফের পায়ে মাথা ঠেকাতে গেল।

আরিফ আরে করো কি বলে কয়েক পা পিছিয়ে এসে বলল, মাথা শুধু আল্লাহ্ পাককে সেজদা করার জন্য। কারো পায়ে মাথা ঠেকান কবিরা গোনাহ? এমন কি কাউকে সম্মান দেখানোর জন্য মাথা নিচু করাও ইসলামে নিষিদ্ধ। তারপর তাদের হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের বাড়ি কোথায়? তোমরা কি আমার ও সাজ্জাদ ভাইয়ের সম্পর্কের কথা এবং কেন সে আমাকে মেরে ফেলতে চায়, সে সব কথা জান?

খালেক বলল, আমাদের বাড়ি এনায়েতপুরেই। আপনি তার চাচাত ভাই, আপনার যা পরী ছিল, আপনি সাজ্জাদ সাহেবদের ক্ষতি করবেন, এই সব কথা বলে আমাদের দশ হাজার টাকা দিয়ে বললেন, কাজ হাসিল হবার পর আরো দশ হাজার দেবেন।

আরিফ আবার জিজ্ঞেস করল, সেই টাকা থেকে তোমরা কত খরচ করেছ?

খালেক বলল, এক হাজার। আর মালেক বলল, দেড় হাজার।

আরিফ বলল, ঠিক আছে, তোমরা ফিরে গিয়ে বাকি টাকা ফেরত দিয়ে দিয়ো। আর যে টাকাটা খরচ করে ফেলেছ, সেটা আমি কিছুদিনের মধ্যে এনায়েতপুরে গিয়ে তোমাদেরকে দিয়ে দেব। তোমরা তখন তাকে দিয়ে দিয়ো। আর শোন— যা ওয়াদা করেছ, তা পালন করো। এরকম অন্যায় পথে টাকা রোজগার না করে পরিশ্রম করে রোজগার কর। দরকার হলে চাষের কাজ কর। রিক্সা চালাও, অথবা অন্য কোন কাজ কর। তাতে আল্লাহ্ পাক বরকত দেবেন। তোমরা তো বোধ হয় নামাজ-রোযা কর না। এবার থেকে ঠিক মত নামাজ পড়বে। রমজান মাসে রোযা রাখবে। মিথ্যে কথা বলবে না। আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে। দেখবে তিনি কোন প্রকারে না কোন প্রকারে তোমাদের রোজগারের ব্যবস্থা করে দেবেন। তোমরা কি শোন নাই, কারো ক্ষতি করা মানে নিজেরই ক্ষতি করা? দুনিয়াতে বদলা আল্লাহপাক দেখিয়ে দেন। তোমরা আমার বাবা মাকে সন্তান হারা করলে, একদিন না একদিন তোমরাও সন্তান হারা হতে। যাও, এবার তোমরা ফিরে গিয়ে যা বললাম তাই কর। পিস্তল দু'টো আমার কাছে থাক, সময় মত থানায় জমা দিয়ে দেব। চিন্তা করো না তোমাদের কথা থানায় জানাবো না। শেষবারের মত বলছি, আবার যদি তোমরা এই রকম কাজ কর, তাহলে সেদিন আর তোমাদেরকে ক্ষমা করব না। কথা শেষ করে আরিফ বাড়ির পথে হাঁটা দিল।

গোফরান সাহেব যখন স্ত্রীকে নিয়ে মাঝে মাঝে ঢাকায় এসে থাকেন তখন তার এক ফুফাতো ভাই আনোয়ার মিয়া ও তার স্ত্রী মাজেদা বেগমকে বাড়িতে রেখে যান। এবারেও তাদেরকে রেখে গেছেন। অবশ্য দু'জন কাজের লোক ও একজন কাজের মেয়ে সব সময় থাকে।

আনোয়ার মিয়ার বাড়ি পাশের গ্রামে। ওঁদের পাঁচ মেয়ে। কোন পুত্র সন্তান নেই। ছোট মেয়ের স্বামীকে ঘর জামাই করে রেখেছেন। সেই সবকিছু দেখাশুনা করে। অবশ্য বিষয়-সম্পত্তি পাঁচ মেয়েকে সমান ভাগে ভাগ করে উইল করে রেখেছেন। স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য তার নামেও উইল করেছেন। কিন্তু একথা কাউকে জানাননি। শুধু গোফরান সাহেব ও সুফিয়া বেগমকে বলেছেন।

অসময়ে আরিফকে আসতে দেখে মাজেদা বেগম আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, খবর সব ভাল তো বাবা? তুমি হঠাৎ চলে এলে যে? ভাইয়া, ভাবী এল না?

আরিফ কদমবুসি করে বলল, হ্যাঁ চাচী আম্মা খবর সব ভাল, আমি একটা কাজে এসেছি, দু'একদিনের মধ্যে চলে যাব। আমি যাবার পর তারা আসবে।

আরিফ দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে মসজিদে জোহরের নামাজ পড়তে গিয়ে রফিককে মসজিদে দেখতে পেল, নামাজের পর তার সঙ্গে সালাম বিনিময় করে বলল, তোর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল, এখন সময় দিতে পারবি?

রফিক বলল, আমি এখনো ভাত খাইনি। তুই যদি খেয়ে থাকিস, তাহলে মাদ্রাসার বারান্দায় অপেক্ষা কর, আমি আধাঘন্টার মধ্যে আসছি। নচেৎ তুইও খেয়ে আয়।

আরিফ মাদ্রাসার বারান্দায় বসে রফিকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

বিশ-পঁচিশ মিনিট পর রফিক এসে তার পাশে বসে বলল, বল কি বলতে চাস?

আরিফ বলল, তুই যদি চিঠিটা আরো আগে দিতিস, তাহলে চাচার সঙ্গে দেখা হত। তোর চিঠি পাওয়ার পরের দিন আমি এনায়েতপুর গিয়েছিলাম। চাচা মারা গেছেন, সেখান থেকেই আসছি। যাকগে আসল কথায় আসি, আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হবার কারণটা বলবি?

রফিক কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, কারণটা জেনেও তুই জিজ্ঞেস করছিস কেন? সে কথা আগে বল।

ঃ সিওর হবার জন্য।

ঃ যদি বলি যা জেনেছিস, সেটাই ঠিক? তাহলে নিশ্চয় সিওর হবি?

ঃ হ্যাঁ হব। তবুও তোকে দু'চারটে কথা বলব। তোর চাচার সম্পত্তির জন্য তুই যদি আমাকে সত্যিই দুশমন ভাবিস, তাহলে আমি তোদেরকে এ সম্পত্তি ফিরিয়ে দেব। বিষয়-সম্পত্তির উপর আমার কোন লোভ-লালসা নেই। তবে, তোর চাচা-চাচী যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন কিছু করতে পারব না। কারণ ওঁরা মনে ভীষণ কষ্ট পাবেন। ওঁরা দুনিয়া থেকে চলে যাবার পর আমি সব কিছু তোদের নামে লিখে দেব। আমার কথার নড়চড় যে কোন দিন হবে না, সে কথা তুই অন্তত জানিস। তোর চিঠি পাবার পর ফুফা-ফুফিকে আমার আসল পরিচয় জিজ্ঞেস করি, তারা সব কিছু আমাকে জানিয়েছে। আরো জানিয়েছে আমার মরহুম আব্বার কথামত তারা আমাকে নিজেদের ছেলে করে নিয়েছে। যাই হোক, আশা করি এরপর তুই আমাকে শত্রু না ভেবে আবার বন্ধু বলে গ্রহণ করবি। একটা কথা জেনে রাখিস, তুই আমাকে শত্রু ভাবলেও আমি তোকে সব সময় বন্ধু বলেই মনে রেখেছি। তোর চাচা-চাচীর নিষেধ সত্ত্বেও গোপনে তোর সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তুই আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিস। হাদিসে পড়েছি এক মুসলমান অন্য মুসলমানের সঙ্গে কোন কারণেই তিনদিনের বেশি শত্রুতা রাখা তো দূরের কথা, এমন কি কথা বলা বন্ধ রাখাও নিষিদ্ধ। তোর কাছে আমার একটাই অনুরোধ, আমার কথার উপর আস্থা রাখিস। আর বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে যা বললাম, তা এখন কারো কাছে প্রকাশ করবি না।

রফিক বলল, তোর বাবার বিষয়-সম্পত্তি ও ব্যবসাপত্র সম্বন্ধে কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছিস?

ঃ করেছি, তবে সে সব তোকে এখন বলতে পারব না। পরে এক সময় বলব।

ঃ ঠিক আছে, তাই বলিস। এখন তাহলে আসি, আমাকে আবার কামলাদের নিয়ে মাঠে যেতে হবে। তা দু'চারদিন আছিস তো?

আরিফ বলল, না থাকতে পারব না। কাল সকালে চলে যাব।

রফিক বলল, আবার এলে দেখা হবে। তারপর সালাম বিনিময় করে চলে গেল।

আরিফ আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে ঘরে ফিরে এল। পরের দিন সকালে ঢাকায় রওনা দিল।

আরিফ ঢাকার বাসায় ফিরে এলে সুফিয়া বেগম ও গোফরান সাহেব এনায়েতপুরের খবরাখবর জিজ্ঞেস করলেন।

আরিফ বলল, খবর সব ভাল। চাচী-আম্মা আদর-যত্ন করেছেন। সাজ্জাদ ভাইও ভাল ব্যবহার করেছেন। তাদের দুরভিসন্ধির কথা জানাল না।

রাতে ঘুমোবার সময় সুফিয়া বেগম আরিফকে জিজ্ঞেস করলেন, ফাল্গুনী নামে কোন মেয়েকে চিনিস নাকি?

আরিফ বেশ অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ চিনি। তুমি তার কথা জানলে কি করে?

ঃ কয়েক দিন আগে ফাল্গুনী তার আব্বার সঙ্গে তোর সাথে দেখা করতে এসেছিল। তার আব্বার মুখে শুনলাম, তুই নাকি তার মেয়ের জীবন বাঁচিয়েছিস। সে কথা জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গেলেন। আমাদের সবাইকে তাদের বাসায় যাবার দাওয়াত দিয়ে গেছেন।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হ্যাঁ তাই। ফাল্গুনীর মা নেই। আমাকে মা ডেকেছে। আমারও তো মেয়ে নেই। তাই আমিও তাকে মেয়ে বলে গ্রহণ করেছি। তাছাড়া আমার ও তোর আব্বার ফাল্গুনীকে খুব পছন্দ। তাকে আমরা বৌ করতে চাই।

আরিফ লজ্জা পেয়েও হেসে উঠে বলল, তা কি করে হয়? ফাল্গুনীর আব্বা খুব ধনী লোক। পাড়াগাঁয়ের আমাদের মত ঘরে মেয়ে দেবেন কেন?

ঃ সেসব আমরা বুঝব, তুই রাজি আছিস কিনা বল?

ফাল্গুনীকে দেখার পর থেকে আরিফ এক মুহূর্তের জন্য তাকে মন থেকে সরাতে পারেনি, তার কেন জানি দৃঢ় ধারণা হয়েছে ফাল্গুনীকে সে স্ত্রীরূপে পাবেই। এখন মায়ের কথা শুনে সেই ধারণা আরো দৃঢ় হল। বলল, আগে পরীক্ষা শেষ হোক তারপর বলব।

ঃ কেন এখন বলবি না কেন? তোর মতামত পেলে আমরা কথাবার্তা বলে রাখব। পরীক্ষার পর না হয় বিয়ে হবে।

ঃ তোমরা আমার বিয়ের জন্য এত তাড়াহুড়ো করছ কেন? পরীক্ষার পর আমি ব্যবসা করার মনস্থ করেছি। ব্যবসাতে দাঁড়িয়ে তারপর বিয়ে করব।

ঃ বিয়ে করলে বুঝি ব্যবসা করা যায় না? ফাল্গুনীর মত মেয়ে সব সময় পাওয়া যাবে না। অত দিন কি তার আব্বা অপেক্ষা করবেন?

আরিফ ফাল্গুনীকে কামনা করে, তবে পরীক্ষার পর। তাই বলল, কোন কাজ তাড়াতাড়ি করতে নেই।

ঃ দেখ আরিফ কথা ঘোরাবি না। কি করতে হবে না হবে, তা আমরা জানি। আমি শুধু তোর মতামত জানতে চাই।

মা রেগে গেছে বুঝতে পেরে আরিফ মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমি কি তোমাদের কথার বরখেলাপ কখনো কিছু করেছি? তোমরা যদি একটা কালো পেঁচীকেও বৌ করতে চাও, তাতেও অমত করব না।

সুফিয়া বেগম হেসে উঠে বললেন, কালো পেঁচীকে বৌ করতে যাব কোন দুঃখে? তুই কি আমাদের শত্রু? এবার বল কবে আমাদেরকে নিয়ে ফাল্গুনীদের বাসায় যাবি?

ঃ আমি নিয়ে যাব মানে? আমাকে তো তারা দাওয়াত দেয়নি, দিয়েছে তোমাদেরকে।

ঃ তুই ছিলি যে, তোকে দিবে? তবু আমাদেরকে বলে গেছে তোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে।

ঃ বলুকগে আমি যাব না, তোমরা যেতে পার। এখন যাও এবার আমি ঘুমাব।

সুফিয়া বেগম ছেলের কাছ থেকে স্বামীর কাছে এসে বললেন, ফাল্গুনীকে আরিফের পছন্দ।

গোফরান সাহেব বললেন, এতক্ষণ ধরে ছেলের সাথে সেই কথাই হচ্ছিল বুঝি?

ঃ হ্যাঁ, জান, আরিফ এত দুষ্টু হয়েছে প্রথমে কি কিছুতেই বলতে চায়। শেষে আমি যখন রেগে গেলাম তখন বলল, আমরা যদি কালো পেঁচীকেও বৌ করতে চাই, তাতেও তার আপত্তি নেই।

গোফরান সাহেব হেসে উঠে বললেন, আরিফ ওর বাপের মত হয়েছে। তোমার মনে নেই জাকির কি রকম ছিল?

ঃ মনে নেই আবার, আরিফের চেয়ে জাকির অনেক বেশি দুষ্টু ছিল। সে যাই হোক, আরিফ আমাদের সাথে যেতে চাচ্ছে না।

ঃ যেতে না চাইলে আমরা জোর করে তো আর নিয়ে যেতে পারবো না।

দিন দুই পর আরিফ পরীক্ষার খবর জানার জন্য ভার্সিটিতে গিয়েছিল। ফেরার সময় নীলক্ষেত থেকে বাস ধরবে বলে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে আসছিল। এমন সময় একটা গাড়ি তার পাশে থামতে সেদিকে চেয়ে গাড়ির পিছনের সীটে আরোহীর চোখে চোখ পড়ে গেল। গায়ে চাদর ও মাথায় রুমাল বাঁধা দেখে মেয়েটাকে চেনা চেনা মনে হলেও ঠিক চিনতে পারল না। দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে যখন চলতে শুরু করল তখন তার কানে একটা সুরেলা কণ্ঠ ভেসে এল, আরিফ সাহেব যাবেন না, দাঁড়ান। এই কথা বলে মেয়েটা গাড়ি থেকে নেমে এল।

কণ্ঠস্বর শুনে চিনতে পেরে আরিফ দাঁড়িয়ে পড়ে তার দিকে ঘুরে সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন? আমি তো প্রথমে আপনাকে চিনতে পারিনি।

ফাল্গুনী সালামের উত্তর দিয়ে বলল, যাক চিনতে পেরেছেন জেনে খুশি হলাম। কেমন আছেন বলুন?

ঃ আল্লাহ পাকের রহমতে ভাল। আমি কিন্তু ঐ প্রশ্নটা আগেই করেছি।

ঃ আমিও আল্লাহ পাকের রহমতে ভাল আছি। গাড়িতে উঠুন, কোথায় যাবেন বলুন, পৌঁছে দিচ্ছি।

ঃ আপনি আবার কষ্ট করতে যাবেন কেন? আমি বাসে করে চলে যাব।

ঃ কষ্ট আবার কিসের? কোন আপত্তি শুনব না, উঠুন গাড়িতে।

আরিফ গাড়িতে উঠে জিজ্ঞেস করল, আপনার আব্বা কেমন আছেন?

ঃ ভাল, আপনি সেই যে হাসপাতাল থেকে চলে এলেন, মরলাম না বাঁচলাম আর কোন খোঁজ নিলেন না।

ঃ খোঁজ নেবার ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না। পরের দিন একটা চিঠি পেয়ে দেশে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরে শুনলাম, আপনি ও আপনার আব্বা আমাদের বাসায় গিয়েছিলেন।

ঃ ঐ দিন আব্বা কিন্তু আপনাদেরকে আমাদের বাসায় আসবার জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন।

ঃ সে কথা আম্মা বলেছে।

ঃ তা কবে আসছেন?

ঃ সে কথা আব্বা-আম্মা জানেন। আপনারা আমার বাসার ঠিকানা পেলেন কি করে?

ঃ একদিন নিউ এলিফেন্ট রোডে একটা দোকানে জুতো কিনতে গিয়ে আপনার বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তার কাছ থেকে পাই।

ঃ এখন আমাদের বাড়িতে যাবেন?

ঃ আজ নয়, অন্য দিন।

ঃ কেন আজ গেলে কি হয়?

আরিফ তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল, কিছু বলল না। ফাল্গুনীও তার মুখের দিকে চেয়ে বলল, কিছু বলছেন না যে?

ঃ জোর করে গাড়িতে তুললেন, এখন আবার জোর করে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, এতটা বাড়াবাড়ি কি ঠিক হচ্ছে?

ফাল্গুনী মৃদু হেসে বলল, নিজের মনকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

দেশ থেকে ফেরার পর আরিফের মন ফাল্গুনীকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে ছিল। তারপর মায়ের মুখে তার ও তার আব্বার কথা শুনে সেই ইচ্ছা আরো প্রবল হয়। কিন্তু লজ্জায় তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেনি। এখন তার কথা শুনে বুঝতে পারল, সেও তাকে ভালবাসে। কিছু না বলে তার মুখের দিকে চেয়েই রইল।

ঃ কি দেখছেন?

ঃ আপনি যা দেখছেন।

ঃ এতদিন দেখতে ইচ্ছা করেনি?

ঃ নিজের মনকে জিজ্ঞেস করুন।

ফাল্গুনী আবার মৃদু হেসে বলল, আজ দেখা হবে, এটাই আল্লাহ্ পাকের মর্জি ছিল।

ঃ আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। তা না হলে আমরা কেউ অগ্রণী ভূমিকা নিলাম না কেন?

এই কথা বলে আরিফ দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল।

ফাল্গুনীদের বাড়ি বনানী, আর আরিফের বাসা আগার গাঁও।

তারা গাড়িতে উঠার পর ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। কোথায় যেতে হবে তা কেউ যখন বলল না তখন সে সাহেবের বাড়িতে নিয়ে এল।

ফাল্গুনী আরিফকে সঙ্গে নিয়ে ড্রইংরুমে এসে বলল, আপনি একটু বসুন, আমি আসছি। তারপর ভিতরে চলে গেল।

ফাল্গুনী ভার্সিটি যাবার সময় আব্বাকে বলেছিল। আজ তাড়াতাড়ি ফিরবে। দুপুরে একসঙ্গে খাবে। তাই ইলিয়াস সাহেব মেয়ের ফেরার অপেক্ষায় শুয়ে একটা বই পড়ছিলেন।

ফাল্গুনী আব্বার রুমের দরজার বাইরে থেকে আব্বা বলে ডাকল।

ইলিয়াস সাহেব বইটা বন্ধ করে বললেন, কে ফাল্গুনী? আয় ভিতরে আয়।

ফাল্গুনী পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকে সালাম দিয়ে বলল, আমি নামাজ পড়ে নিই তারপর খাব। তার আগে ড্রইংরুমে চল তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব।

ইলিয়াস সাহেব সালামের উত্তর দিয়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে আনন্দের ছটা দেখতে পেয়ে হেসে উঠে বললেন, তাহলে চল আগে তোর সারপ্রাইজটা গ্রহণ করি।

আব্বাকে শুধু গেঞ্জি গায়ে এগোতে দেখে ফাল্গুনী হ্যাঙ্গার থেকে একটা জামা পরিয়ে দেবার সময় বলল, এটা পরে নাও, নচেৎ ব্যাপারটা অশোভনীয় দেখাবে।

ইলিয়াস সাহেব মেয়ের সঙ্গে ড্রইংরুমে এলেন।

আরিফ দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন?

ইলিয়াস সাহেব হাসিমুখে সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন? আপনার আব্বা-আম্মা ভাল আছেন?

আরিফ বলল, জ্বী, আমরা সবাই আল্লাহ পাকের রহমতে ভাল আছি। কিন্তু আমাকে আপনি করে বলছেন কেন? আমি তো আপনার ছেলের বয়সি। তুমি করে বলুন।

ইলিয়াস সাহেব হেসে উঠে বললেন, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। তারপর মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, বেলা অনেক হয়েছে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ে আয়। আমরা ততক্ষণে আলাপ করি। মেয়ে চলে যাবার পর ইলিয়াস সাহেব আরিফকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের দেশের বাড়ি কোথায়?

ঃ সিরাজগঞ্জ জেলার সমেশপুর গ্রামে।

ঃ তোমরা কয় ভাইবোন?

ঃ আমার কোন ভাইবোন নেই।

ঃ পড়াশুনা শেষ করে কি করবে, ভেবেছ?

ঃ জ্বী, ব্যবসা করার ইচ্ছা আছে।

ঃ খুব ভাল কথা বলেছ। আজকাল চাকরি করে সংসার চালান খুব কষ্টকর। আচ্ছা তুমি রাজনীতি কর?

ঃ জ্বী না।

ঃ কেন?

ঃ প্রথম কারণ, ছাত্র-জীবনে আমি রাজনীতি করা পছন্দ করি না। দ্বিতীয় কারণ, বর্তমান যুগের রাজনীতি মানে মিথ্যার বেশাতী। মিথ্যাকে ইসলাম হারাম করেছে। বর্তমান যুগে যারা রাজনীতি করছেন তারা যেমন অসৎ, তেমনি ধর্মেরও ধার ধারেন না।

ঃ কিন্তু অনেক সৎ ও ধার্মিক লোকও রাজনীতি করছেন।

ঃ সে কথা আমিও জানি। কিন্তু শতের মধ্যে দু'একজন সৎ ও ধার্মিক লোক কি করতে পারেন? তাদের অনেকে ক্ষমতা পেয়ে সৎ ও ধার্মিক আছেন কিনা সন্দেহ। আমি আরো জানি, রাজনীতি করা ইসলামের প্রধান প্রধান আইনগুলোর অন্যতম। কিন্তু কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী রাজনীতি করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। যদিও অনেকে এই পথের পথিক হয়েছেন, তাঁরা কতটা সফলতা লাভ করবেন তা আল্লাহ পাক জানেন। তাদেরকে আল্লাহর আইন ও রসুল (দঃ)-এর সুন্নতের তরীকা অনুযায়ী নিজেদেরকে বলিষ্ঠ চরিত্রবান করে গড়ে তুলে দৈনন্দিন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। নচেৎ শুধু মুখে কোরআন-হাদিসের বুলি আউড়িয়ে কোন সুফল হবে না। তবে যারা এই পথে অগ্রসর হয়েছেন, তাদেরকে আমি কায়মনবাক্যে সমর্থন করি। কারণ কোরআন-হাদিসের আইনের শাসন আমিও কামনা করি এবং প্রত্যেক মুসলমানের, যাদের এতটুকু ঈমান আছে তাদেরও কামনা করা উচিত। কারণ সব মুসলমানের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত, আল্লাহ ও রসুল (দঃ)-এর আইন ছাড়া কোন মানুষের তৈরি আইন জগতে শান্তি আনতে পারে না। যাই হোক, আমি এ বিষয় নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না, হয়তো বেয়াদবি করে ফেললাম, সে জন্য মাফ চাইছি।

ঃ না না, বেয়াদবি হবে কেন? নিজের মতামত প্রকাশ করার অধিকার সবারই আছে।

এমন সময় ফাল্গুনী এসে বলল, আব্বা এবার রাজনীতি রাখ, চল খেতে যাবে। তারপর আরিফকে বলল, চলুন।

খাওয়ার সময় ইলিয়াস সাহেব আরিফকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আব্বা-আম্মাকে আসবার কথা বলেছিলাম, ওঁরা এলেন না কেন?

আরিফ বলল, হয়তো দু'একদিনের মধ্যে আসবেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর ইলিয়াস সাহেব নিজের রুমে যাবার সময় আরিফকে বললেন, তুমি কি এক্ষুনি ফিরতে চাও?

ঃ জ্বী, নচেৎ আব্বা-আম্মা চিন্তা করবেন।

ঃ তাহলে দশ-পনের মিনিট রেস্ট নিয়ে তারপর যেয়ো।

ফাল্গুনী আরিফকে নিয়ে ড্রইংরুমে এসে বসল। তারপর জিজ্ঞেস করল, পাস করার পর কি করবেন?

ঃ ভেবেছিলাম ব্যবসা শুরু করব, কিন্তু তার আগে আব্বা-আম্মা আমার বিয়ে দিতে চান।

ফাল্গুনী মৃদু হেসে বলল, তাতে কি হয়েছে? বিয়ে করার পর ব্যবসায় নামবেন। বৌ তো আর বাধা দেবে না। তা পাত্রী বুঝি ওঁরা আগে থেকে দেখে রেখেছেন?

ঃ না, আগে থেকে দেখে রাখেন নি, ইদানিং দেখেছেন। আমি যখন দেশের বাড়ি গিয়েছিলাম, সেই সময় এক কোটিপতি ব্যবসায়ী তার রূপসী কন্যাকে নিয়ে আমাদের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই মেয়েকে দেখে আব্বা-আম্মা পছন্দ করেছেন। তারা মেয়েকে ও'তার বাবাকে সে ব্যাপারে ইঙ্গিতও দিয়েছেন। তবে মেয়ে বা মেয়ের বাবা রাজি আছেন কিনা বলেন নি। আমাকে আম্মা সে কথা বলে আমার মতামত জানতে চাইল। আমি বললাম কোটিপতি ব্যবসায়ী তার একমাত্র কন্যাকে পাড়াগাঁয়ে বিয়ে দেবেন না। আম্মা বলল, সে ব্যাপারে আমরা বুঝব, তুই রাজি আছিস কিনা বল? আমি বললাম, তোমরা যদি একটা কালো পেঁচীর মত মেয়েকে বৌ করতে চাও, তাতেও আমি রাজি।

আরিফের কথা শুনে ফাল্গুনী খুব লজ্জা পেল, তার টকটকে ফর্সা মুখটা লাল হয়ে গেল। কেউ যেন তার সারা মুখে একরাশ আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। কয়েক সেকেন্ড মাথা নিচু করে থেকে তার দিকে চেয়ে বলল, তাহলে এতক্ষণ কালো পেঁচীর সাথে আপনি আপনি করে কথা বলছেন কেন?

ঃ আপনি কালো পেঁচী নয় বলে।

ফাল্গুনী আরো বেশি লজ্জা পেয়ে বলল, আপনি খুব দুষ্টু ছেলে।

ঃ আপনিও কিন্তু খুব দুষ্টু মেয়ে।

ঃ আমি আবার দুষ্টুমি করলাম কি করে?

ঃ এতক্ষণ আমাকে আপনি করে বলে।

ঃ তাহলে আমরা সমান দুষ্টুমি কি বলেন? এবার দুষ্টুমি বাদ দিয়ে আমরা কি ভাল হতে পারি না?

ঃ পারি।

ঃ তাহলে হচ্ছেন না কেন?

ঃ আগে তুমি হও।

ফাল্গুনী হেসে উঠে বলল, আমাকে আগে হতে বলে তুমিই আগে হয়ে গেলে।

আরিফও হেসে উঠে বলল, যদিও সমাজে লেডিস ফার্স্ট কথাটা চালু আছে, আমি তা মানি না। কারণ, আল্লাহপাক প্রথম মানব হজরত আদম (আঃ)-কে পয়দা করেন। পরে প্রথম নারী হজরত হাওয়া (আঃ)-কে পয়দা করেন। তাছাড়া কোরআন-হাদিসে নারীদের চেয়ে পুরুষদেরকে বড় করে বর্ণনা করা হয়েছে।

ফাল্গুনী হাসতে হাসতেই বলল, তা আমিও জানি এবং বিশ্বাসও করি।

ঃ আচ্ছা আমার সঙ্গে তোমার তো তেমন আলাপও হয়নি, তবু কি করে এতটা অগ্রসর হলে?

ঃ আমিও যদি ঐ একই প্রশ্ন তোমাকে করি?

ঃ ঐদিন বেবী থেকে হাসপাতালে নেবার সময় তোমাকে দেখে আমার মন বলে উঠল, এই মেয়েই আমার জীবন সঙ্গিনী হওয়ার উপযুক্ত। সত্যি বলতে কি, তারপর থেকে আমার দৃঢ় ধারণা হল, তোমাকে আমি জীবন সঙ্গিনী হিসাবে পাবই।

ঃ কি আশ্চর্য! হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে পাবার পর আকাশী খালার কাছে তোমার কথা শুনে এবং তোমাকে দেখে তোমার মত আমারও তাই মনে হয়েছে এবং তুমি যে আমার জীবনসঙ্গী হবে, সে ধারণাও দৃঢ় হয়েছে।

আরিফ সুবহান আল্লাহ্ বলে বলল, সবকিছু আল্লাহ্পাকের কুদরত। তাঁর কুদরত বুঝা মানুষের অসাধ্য। এবার আসি, কথায় কথায় অনেক দেরি করে ফেললাম। আব্বা-আম্মা হয়তো না খেয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

ফাল্গুনী বলল, তাহলে তো দেরি করিয়ে দিয়ে অন্যায় করে ফেললাম। তোমার আম্মা-আব্বাকে নিয়ে কাল আসবে তো?

ঃ আমি আসতে পারব কিনা ঠিক কথা দিতে পারছি না, তবে আব্বা-আম্মাকে আসতে বলব। তোমার সঙ্গে আমার আরো কিছু কথা আছে, কখন সময় দিতে পারবে বল।

ঃ তোমার সুবিধে মত এখানে চলে এস। কয়েকদিন ভার্সিটি বন্ধ আছে। যে কোনদিন যে কোন সময়ে আসতে পার।

ঃ ঠিক আছে তাই আসব— বলে আরিফ উঠে দাঁড়াল।

ফাল্গুনী 'এক মিনিট' বলে ভিতরে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বলল, ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বলে এলাম।

ঃ তুমি কোথাও যাবে না কি?

ঃ না তোমাকে পৌছে দেবে।

ঃ এখন থেকেই বন্দি করতে চাও বুঝি?

ফাল্গুনী নির্বাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। চোখে পানি এসে যেতে মাথা নিচু করে ভিজে গলায় বলল, এ রকম কথা বলতে পারলে? আল্লাহপাক আমার দিলের খবর জানেন। আমি শুধু কর্তব্য পালন করতে চেয়েছি।

আরিফ ফাল্গুনীর অবস্থা দেখে ও তার কথা শুনে প্রথমে বেশ ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। তারপর সামলে নিয়ে তার কাছে এসে একটা হাত ধরে বলল, বোকা মেয়ের মত আমাকে ভুল বুঝছ কেন? আল্লাহপাক সবারই দিলের খবর জানেন, কথাটা আমি প্রসঙ্গক্রমে বলে ফেলেছি। তোমার মনে আঘাত দেবার জন্য বলিনি। তবু ক্ষমা চাইছি।

আরিফ ফাল্গুনীর হাত ধরতে তার সমস্ত শরীরে অজানা এক আনন্দের শিহরণ বইছিল। তারপর তার কথা শুনে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলল, তোমার কথাই ঠিক। আমিই তোমাকে ভুল বুঝে অন্যায় করেছি, আমাকে মাফ করে দাও।

আরিফ তার হাত দু'টোতে চুমো খেয়ে ছেড়ে দিয়ে বলল, আমরা দু'জনে আগে দুষ্টুমি করেছি, এখন আবার বোকামি করে ফেললাম। দুষ্টুমির মত বোকামিটাও আর আমরা করব না, কেমন?

ফাল্গুনী কান্নামুখে হেসে ফেলে বলল, ঠিক আছে তাই হবে। চল, তোমাকে গাড়িতে তুলে দেই।

আরিফকে নিয়ে গাড়ি বেরিয়ে যাবার পর ফাল্গুনী নিজের রুমে এসে খাটে শুয়ে হাতের চুমো খাওয়া জায়গায় কয়েকবার চুমো খেল। তারপর আরিফের কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন বেলা ন'টার সময় ফাল্গুনী গাড়ি নিয়ে আরিফদের বাসায় এসে সুফিয়া বেগমকে সালাম দিয়ে কদমবুসি করে বলল, আপনারা তো মেয়ের বাড়ি গেলেন না, তাই মেয়ে নিজেই নিতে এলাম। খালু আব্বা কোথায়?

সুফিয়া বেগম সালামের উত্তর দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে মাথায় চুমো খেয়ে দোওয়া করলেন। তারপর বললেন, তোমার খালু আব্বা একটু বাইরে গেছেন, এক্ষুনি এসে পড়বেন।

ফাল্গুনী বলল, আপনাদের ছেলেও কি বাইরে গেছেন?

সুফিয়া বেগম বললেন, না, আরিফ তার রুমে পড়ছে। তুমি তার কাছে গিয়ে আলাপ কর, আমি ওমরকে দিয়ে তোমার খালু-আব্বাকে ডেকে আনার ব্যবস্থা করছি।

আরিফদের বাসাটা এল প্যাটার্নের তিন রুমের বাড়ি। গেটের দিকের রুমটা ড্রইংরুম, মাঝখানের রুমে গোফরান সাহেব ও সুফিয়া বেগম এলে থাকেন। শেষের

রুমটায় আরিফ থাকে, সেখানেই সে পড়াশুনা করে। ওমর রান্না ঘরের বারান্দা ঘিরে থাকে।

ফাল্গুনী মাঝখানের রুম থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে আরিফের রুমের দরজার পর্দা সরিয়ে ঢুকে দেখল, সে বই খুলে রেখে সেদিকে তাকিয়ে আছে। পা টিপে টিপে তার পিছনে এসে চোখ টিপে ধরল।

আরিফ চমকে উঠে হাতের উপর হাত রেখে সুবহান আল্লাহ বলে বলল, সেই আল্লাহ পাকের দরবারে হাজারো শুকরিয়া জানাই, যিনি আমার মনের ইচ্ছা পূরণ করলেন। তারপর হাত ধরে সামনে এনে সালাম দিয়ে তাকে খাটে বসিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ?

ফাল্গুনী হাসিমুখে সালামের উত্তর দিয়ে বলল, ভাল। তুমি?

ঃ আমিও তোমার মত। হঠাৎ এলে যে?

ঃ তুমি মনে মনে আমাকে ডাকছিলে, তাই চলে এলাম। অবশ্য আব্বা সবাইকে নিয়ে যেতেও বলেছে। আচ্ছা আমিই যে তোমার চোখ টিপেছি, সিওর হলে কি করে?

ঃ যে ফাল্গুনী, ফাল্গুনী বাতাসের মত অহরহ আমার হৃদয়ে বয়ে চলেছে, তার সুগন্ধই আমাকে আগাম বার্তা জানিয়ে দিয়েছে। তাই তো আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করলাম।

ফাল্গুনী উঠে এসে আরিফের দু'টো হাত ধরে চুমো খেল। তারপর হাত দু'টো নিজের দু'গালে চেপে ধরে ছলছল চোখে বলল, তুমি আমাকে এ.....ত .....ভালবাস?

আরিফ কোন কথা না বলে ফাল্গুনীর দু'টো হাত নিয়ে চুমো খেয়ে নিজের দু'গালে চেপে ধরে একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তার চোখ দু'টোও পানিতে ভরে উঠল। ভিজে গলায় বলল, আমরা দু'জনে দু'জনকে সমান ভালবাসি। তারপর ফাল্গুনীকে আবার খাটে বসিয়ে চোখ মুছে বলল, কাল তোমাকে যে কথা বলব বলে বলেছিলাম, তা তোমার শোনা একান্ত দরকার। বলছি শোন, তোমরা যাদেরকে আমার আব্বা-আম্মা বলে জান, তারা আমার ফুফা-ফুফি। আমার আব্বার নাম মরহুম জাকির হোসেন, আর আমার আম্মার নাম মরহুমা আজরা সাদিয়া। আমার বয়স যখন দু'বছর তখন আম্মা মারা যান। আর সাড়ে তিন বছরের সময় আব্বা মারা যান। আমার আম্মাকে নিয়ে একটা কিংবদন্তী আছে। তিনি নাকি পরী ছিলেন। তারপর নানা-নানী, চাচা-চাচী ও চাচাতো ভাই-বোনদের এবং ফুফা-ফুফির সব কথা বলল, আরো বলল। তার পৈতৃক ও ফুফার কাছ থেকে পাওয়া সম্পত্তি কি করবে না করবে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এসব তোমাকে আরো আগে জানাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সময়-সুযোগের অভাবে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এরপরও কি তুমি আমাকে আগের মত ভালবাসতে পারবে?

ফাল্গুনী কয়েক সেকেন্ড কোন কথা বলতে পারল না। ভালবাসার কথা জিজ্ঞেস করতে তার মনে ভীষণ আঘাত লাগল। সামলে নিয়ে তার দু'টো হাত ধরে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল, ভালবাসি বললে তোমাকে অপমান করা হবে। এক কথায় তুমিই আমার প্রাণ। প্রাণহীন দেহ যেমন, তোমাহীন আমি তেমন। তুমি যদি বস্তির গরিব ছেলে হতে, তবু তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতাম না। সবচেয়ে বড় কথা কি জান, আমরা তো বর্তমান যুগের ছেলে-মেয়েদের মত ভালবাসা-বাসি করিনি। আল্লাহপাক তাঁর কুদরতী ইশারায় আমাদের মনে ভালবাসার বীজ বপন করে দিয়েছেন। সেখানে উচ্চ-নিচ, গরিব বড়লোকের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে তুমি যা ভাল বুঝেছ, তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছ। তোমার বিবেচনা ও সিদ্ধান্তকে আমি সব সময় সানন্দে গ্রহণ করব। আল্লাহপাক মেহেরবানী করে আমাকে কিছু কিছু দ্বীনি কেতাব পড়ার তওফিক দিয়েছেন। সেই জ্ঞান আমাকে শিক্ষা দিয়েছে, আল্লাহপাকের কাছে

পার্থিব ধন-সম্পত্তির মালিকের চেয়ে ধার্মিক ও চরিত্রবান নর-নারী অধিক প্রিয়। তাঁদের সম্বন্ধে কোরআন ও হাদিসে অনেক সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে।

আরিফ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুবহান আল্লাহ বলে বলল, আল্লাহপাক তুমি মহান, তোমার সমতুল্য আকাশমণ্ডলীতে ও ভূমণ্ডলে কেউ নেই। তুমি আমাকে অনেক বড় দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলে। সেই জন্য তোমার পাক দরবারে জানাই শতকোটি শুকরিয়া।

এমন সময় সুফিয়া বেগমের ডাক তারা শুনতে পেল, আরিফ ফাল্গুনীকে নিয়ে এ রুমে আয়।

আরিফ ফাল্গুনীর হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের চোখমুখ মুছতে মুছতে বলল, তুমিও মুছে নাও। তারপর আম্মাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আসছি আম্মা।

কিছুক্ষণ আগে গোফরান সাহেব এসে, ফাল্গুনী নিয়ে যেতে এসেছে শুনে তৈরি হয়েছেন, সুফিয়া বেগমও তাই।

আরিফ ফাল্গুনীকে নিয়ে তাদের কাছে এলে সুফিয়া বেগম ওমরকে নাস্তা দিতে বলে আরিফকে বললেন, তুইও চল না আমাদের সাথে।

আরিফ এক পলক ফাল্গুনীর দিকে চেয়ে বলল, তোমাদের মেয়ে তোমাদেরকে নিয়ে যেতে এসেছে। আমি যাব কেন?

সুফিয়া বেগম ফাল্গুনীর দিকে চেয়ে তার মুখে হাসি দেখে ছেলে যে দুষ্টুমি করছে বুঝতে পারলেন। বললেন, তুই তোর বাপের মত হয়েছিস। সব সময় দুষ্টুমি, যা গেলে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে।

আরিফ গাল ভার করে বলল, বিনা দাওয়াতে আমি কারো বাড়ি যাই না, তোমরা যাও। তারপর নিজের রুমে চলে গেল।

ওমর নাস্তা নিয়ে এলে ফাল্গুনী সামান্য কিছু খেয়ে বলল, চলুন আম্মা, অনেক দেরি হয়ে গেল, আব্বা চিন্তা করছেন।

সেদিন ফাল্গুনীদের বাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়ার পর গোফরান সাহেব ও সুফিয়া বেগম ইলিয়াস সাহেবের সঙ্গে আরিফ ও ফাল্গুনীর বিয়ের কথাবার্তা পাকা করে ফেললেন। শুধু বিয়ের দিন বাকি থাকল। আরিফের পরীক্ষার পরদিন ঠিক হবে। সুফিয়া বেগম নিজের হাতের আংটি খুলে ফাল্গুনীর হাতে পরিয়ে দোওয়া করে বললেন, আমরা কয়েক দিনের মধ্যে গ্রামের বাড়িতে চলে যাব। এর মধ্যে তুমি আমাদের বাসায় আসবে।

গোফরান সাহেব একটা কাগজে ঠিকানা লিখে ইলিয়াস সাহেবের হাতে দিয়ে বললেন, মাঝে মাঝে পত্র দিলে খুশি হব।

ইলিয়াস সাহেব বললেন, ছাতো দেবই। হয়তো দেখবেন, একদিন বাপ-বেটী আপনাদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছি।

গোফরান সাহেব বললেন; আল্লাহপাক আপনার ইচ্ছা পূরণ করুন। গেলে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করব।

বিকেলে চা-নাস্তা খেয়ে গোফরান সাহেব ও সুফিয়া বেগম ফিরে এলেন।

সেদিন এক সময় সুফিয়া বেগম আরিফকে বললেন, ফাল্গুনীর সঙ্গে তোর বিয়ের কথা পাকাপাকি করে এসেছি। পরীক্ষার পর বিয়ের কাজ সারতে চাই।

আরিফ কিছু না বলে চুপ করে রইল।

ঃ কিরে, কিছু বলছিস না কেন?

ঃ এখন আবার কি বলব! যা বলার তো আগেই বলেছি।

এর কয়েক দিন পর গোফরান সাহেব ও সুফিয়া বেগম সমেশপুরে ফিরে গেলেন।

ছয়

এদিকে খালেক ও মালেক ফিরে এসে সাজ্জাদকে টাকা ফেরত দিয়ে বলল, বাকি টাকা কিছু দিনের মধ্যে দিয়ে দেব। যে কাজের জন্য টাকা নিয়েছিলাম, তা আমরা করতে পারব না।

সাজ্জাদ রেগে উঠে বলল, কেন?

খালেক বলল, কেনর উত্তর দিতে পারব না। তবে শুধু একটা কথা বলতে পারি, আরিফ সাহেব আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন। আপনিই তো বলেছেন, তিনি পরীর ছেলে। আমাদের মত দু'চারজন কেন, যদি শতশত মানুষও তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে, তবু সফল হবে না।

সাজ্জাদ তাদের কথা শুনে বলল, কি এমন ঘটনা ঘটল যে, তোরা এরকম কথা বলছিস?

মালেক বলল, আরিফ সাহেব ঢাকায় না গিয়ে সমেশপুরের কবরস্থানের পাশের জঙ্গলে গিয়ে একটা কবর জিয়ারত করল। তারপর যখন সে ফিরে আসছিল তখন প্রথমে আমরা তাকে ড্যাগার মেরে শেষ করতে চাইলাম, কিন্তু কেউ যেন আমাদের ড্যাগারসহ হাত ধরে রাখল। কিছুক্ষণ পর হাত ছেড়ে দিল। আমরা তখন দু'জন দু'টো পিস্তল দিয়ে তার বুকে গুলি করি। গুলির নিশানা ঠিকমত লাগলেও তার কিছু হল না। বরং উল্টো আমাদেরকে এমন মার মেরেছে যে মারের কথা আমরা জানি না। কি দারুণ ক্ষমতা আরিফ সাহেবের, যা আমরা কল্পনা করতে পারি নাই। আমাদের পিস্তল কেড়ে নিয়ে আমাদেরকেই মেরে ফেলতে চেয়েছিল। আমরা কান্নাকাটি করে তার কাছে ওয়াদা করেছি, জীবনে আর কোন দিন কোন অন্যায় করব না। তাই আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন।

সাজ্জাদ আরিফের অলৌকিক ক্ষমতার কথা ছোটবেলায় মায়ের কাছে শুনেছে। এখন এদের কথা শুনে বেশ চিন্তায় পড়ে গেল। ভাবল, মাকে ঘটনাটা জানিয়ে যা করার করা যাবে। ওদের বলল, তোরা কাপুরুষ, তা না হলে এমন কথা বলতে পারতিস না। এত খুন-খারাবি করে বেড়াস, আর সামান্য একটা ছেলের কাছে মার খেয়ে ফিরে এলি। বুঝতে পারছি, তোদের দ্বারা এ কাজ হবে না। আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। ঠিক আছে, তোরা এখন যা।

সেদিন সাজ্জাদ ঘরে এসে মাকে গুণ্ডাদের কথা বলল।

নিহারবানু অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমার বিশ্বাস আরিফের সঙ্গে জ্বীন থাকে। ওকে এখানকার কেউ মারতে পারবে না। তুই যদি সিরাজগঞ্জের গুণ্ডাদের হাত করতে পারিস, তাহলে তারা হয়তো কাজটা করতে পারে।

সাজ্জাদ বলল, সে ব্যবস্থা আমি করতে পারব। আমার মনে হয় আরিফ সিরাজগঞ্জ কোর্টে নিশ্চয় আসবে। সেই সময় যা করার করতে হবে।

নিহারবানু বললেন, তাই কর। কিন্তু আরিফ কখন আসবে তুই জানবি কি করে?

সাজ্জাদ বলল, সে ব্যবস্থা আমি করব।

আরিফ যেদিন রফিকের সঙ্গে সম্পত্তির ব্যাপারে আলাপ করল; সেদিন রফিক আরিফের কথাগুলো আব্বাকে জানাল।

সামসু বাঁকা হাসি হেসে বললেন। আরিফ খুব চালাক। সে তোকে বোকা বানিয়েছে। আমি তার চালাকি ধরে ফেলেছি। কবে গোফরান আর তার বৌ মরবে তা কি কেউ জানে নাকি? আসলে ঐ কথা বলে তোকে বশে আনতে চেয়েছে। তুই এক কাজ কর, তোর সাথে তো আরিফের চাচাতো ভাই সাজ্জাদের জানাশুনা আছে। সে তার

চাচার সম্পত্তি নিজের নামে করে নিয়েছে। সেও আরিফের দুশমন। তুই তার সঙ্গে যোগাযোগ করে তোরা দু'জনে মিলে আরিফকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।

রফিক বলল, তুমি ঠিক কথা বলেছ আব্বা। আমি দু'একদিনের মধ্যে তার সঙ্গে দেখা করব।

সামসু বললেন, যাই করিস না কেন খুব সাবধানে করবি। কেউ যেন তোদের সন্দেহ করতে না পারে।

দু'দিন পর রফিক এনায়েতপুরে এসে সাজ্জাদের সঙ্গে দেখা করে তার মনের ইচ্ছার কথা জানাল।

সাজ্জাদ রফিকের কথা শুনে খুশি হল। বলল, মাঝে মাঝে এসো, দরকার পড়লে আমিও তোমার সঙ্গে গোপনে দেখা করব। তারপর কিভাবে কি করবে বলল।

রফিক বলল, তোমার প্ল্যান খুব ভাল। গুণ্ডাদের সঙ্গে যত টাকার কন্ট্রাক্ট হবে, তার অর্ধেক আমি দেব।

সাজ্জাদ বলল, ঠিক আছে, তাই দিয়ো; কিন্তু খুব সাবধান—এসব কথা দ্বিতীয় কোন লোকের কানে যেন না যায়।

রফিক বলল, সে কথা তোমাকে বলে দিতে হবে না। তারপর তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

গোফরান সাহেব ও সুফিয়া বেগম চলে যাবার কয়েক দিন পর আরিফ উকিলের চিঠি পেল। পড়ে দেখল, সবকিছু রেডী। তাকে তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন। আরিফ একদিন ভার্সিটিতে ফাল্গুনীর সঙ্গে দেখা করে বলল, তোমার মন এত শক্ত কেন?

ঃ প্রমাণ করতে পারবে?

ঃ নিশ্চয়।

ঃ কর।

ঃ এই বেচারার প্রতি নির্মম ব্যবহারটাই তার প্রমাণ।

ফাল্গুনী মৃদু হেসে বলল, নির্মম হলে বিয়েতে রাজি হতাম না।

ঃ কিন্তু আজ পাঁচ-ছয়দিন তোমার পাত্তা নেই, আমার কষ্ট হয়নি বুঝি?

ঃ একই প্রশ্ন যদি আমি করি?

ঃ তা করতে পার; তবে আমার মনে হয় দু'জনেরই প্রশ্নের উত্তর হবে, লজ্জা—তাই না?

ফাল্গুনী হাসতে হাসতেই বলল, জ্বী তাই।

আরিফ বলল, কাল আমাকে দেশের বাড়ি যেতে হচ্ছে। ফিরতে কয়েকদিন দেরি হতে পারে। তাই লজ্জার মাথা খেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। এখন তুমিও কি লজ্জার মাথা খেয়ে আমার বাসায় যাবে?

ফাল্গুনী বলল, বেশ তো চল, তুমি যখন খেতে পেরেছ তখন আমার খেতে দোষ কি?

সেদিন ফাল্গুনী আরিফের বাসায় এসে দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে বিকেল পর্যন্ত গল্প করে কাটাল। তারপর বিকেলে আরিফ তাকে তাদের বাড়িতে পৌছে দিয়ে এল।

পরের দিন সকালে আরিফ সিরাজগঞ্জ রওয়ানা দিল। বিকেলে পৌছে সিরাজগঞ্জ টাউনে একটা হোটেলে থাকল। পরের দিন উকিলের চেম্বারে তার সঙ্গে দেখা করল।

সানোয়ার উকিল কাগজপত্র বের করে টেবিলের উপর রেখে বললেন, সবকিছু রেডী করে রেখেছি। পড়ে দেখে সই করুন। আপনি চাইলে, আজই রেজিস্ট্রি করতে পারেন।

আরিফ সবকিছু পড়ে সই করে বলল, না আজ করব না। আমি আর একটা উইল করতে চাই। দু'টো উইল একই দিনে রেজিস্ট্রি করব। সে জন্যে যদি দু'একদিন থাকতে হয় থাকব।

সানোয়ার উকিল কাগজ-কলম নিয়ে বললেন, বেশ তাই হবে, এখন বলুন কি উইল করতে চান। আমি খসড়া করে নিই।

আরিফ বলল, সমেশপুরে আমার ফুফা যে সব সম্পত্তি আমার নামে দলিল করে দিয়েছেন। সে সব আমি ফুফার চাচাতো ভাই সামসুর ছেলে রফিকের নামে উইল করতে চাই। তবে আমার ফুফা-ফুফি মারা যাবার পর রফিক স্বত্বাধিকারী হবে। তার আগে নয়।

সানোয়ার উকিল তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার ফুফা-ফুফি তো তাদের সবকিছু আপনাকে দলিল করে দিয়েছেন। এখন আপনি সবকিছুর মালিক। ওঁদের মৃত্যুর শর্ত উল্লেখ করতে চাচ্ছেন কেন? ওঁদের তো এই সম্পত্তিতে কোন হক নেই?

ঃ সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আপনাকে বলতে পারব না।

ঃ তাহলে আপনার ফুফা-ফুফির মৃত্যুর পর এই উইল করতে পারতেন।

ঃ তা পারতাম। কিন্তু কে কখন মরবে তা কি কেউ জানে? তাদের আগে আমিও তো মরে যেতে পারি?

সানোয়ার উকিল এই কথার কোন উত্তর দিতে না পেরে কিছুক্ষণ চুপ করে চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, ঠিক আছে তাই হবে। আপনার ফুফা আপনার নামে যে উইল করিয়েছেন, তা আমিই করেছিলাম, তার খসড়া আমার ফাইলে আছে। সেটা দেখে দাগ নাম্বার ও খতিয়ান নাম্বার পেয়ে যাব। আজ-কালের মধ্যে আশা করি সবকিছু রেডী করতে পারব। পরশুদিন দু'টো উইল এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি করাতে পারবেন।

আরিফ বলল, ঠিক আছে তাই হবে। আর শুনুন, দু'টো উইলের ব্যাপারটা খুব গোপন রাখবেন। ঘূণাক্ষরেও অন্য কেউ যেন জানতে না পারে।

সানোয়ার উকিল বললেন, ওসব সম্বন্ধে আমাদেরকে কিছু বলা লাগবে না।

আরিফ বলল, আমি সিরাজগঞ্জে রেস্ট হাউসে আছি। পরশুদিন এই সময়ে তাহলে আসব?

সানোয়ার উকিল বললেন, জ্বী আসবেন।

আরিফ সালাম বিনিময় করে উকিলের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে একজন মুখচেনা লোককে দু'জন অচেনা গুণ্ডা ধরনের লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখে সেদিকে এগিয়ে এল।

আরিফকে তাদের দিকে আসতে দেখে অচেনা লোক দু'টো সেখান থেকে চলে গেল।

আরিফ সেই মুখচেনা লোকটার কাছে এসে সালাম দিয়ে বলল, আপনার বাড়ি এনায়েতপুরে না?

লোকটা থতমত খেয়ে সালামের উত্তর দিয়ে বলল, হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

ঃ বলছি, তার আগে আপনার নাম বলুন।

ঃ আমার নাম জয়নাল। তারপর না চেনার ভান করে বলল, কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না।

ঃ আমি আরিফ, সাজ্জাদের ছোট চাচা মরহুম জাকির হোসেনের ছেলে। আপনি আমার একটা উপকার করবেন?

জয়নাল মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। ম্যাট্রিক পাস করে আজেবাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। প্রথম জীবনে অনেক অকাজ-কুকাজ করেছে। এখন বিয়ে করে ছেলে-মেয়ের বাপ হয়েছে। চাষ-বাস করেই সংসার চালায়। কিন্তু অভাব-অনটনের

মধ্যে দিন কাটায়। আরিফ যখন এনায়েতপুরে এসে কয়েকদিন ছিল তখন সাজ্জাদ তাকে খুন করার জন্য জয়নালকে বেশ কিছু টাকা অফার করেছিল। কিন্তু জয়নাল রাজি হয়নি। বলেছিল এখন ঐসব কাজ ছেড়ে দিয়েছি, আমার ছেলে-মেয়ে আছে। ঐ সব কাজ করলে তাদের ক্ষতি হবে। সেই সময় জয়নাল আরিফকে দেখলেও আরিফের সঙ্গে তার পরিচয় হয় নি। তাই সাজ্জাদ এবারে তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলেছে, তোকে খুন করতে হবে না, শুধু প্রতিদিন সিরাজগঞ্জে কোর্টে গিয়ে লক্ষ্য রাখবি আরিফ এসেছে কিনা। এলে আমার দু'জন লোক তোর সঙ্গে থাকবে, তাদেরকে চিনিয়ে দিবি। তখন জয়নালের বড় ছেলেটার খুব অসুখ। টাকার জন্য চিকিৎসা করাতে পারছিল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও একরকম বাধ্য হয়ে তার কথায় রাজি হয়। প্রতিদিন কোর্টে এসে সাজ্জাদের দু'জন লোকের সঙ্গে সারাদিন গল্প করে কাটায় আর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে। আজ আরিফকে সানোয়ার উকিলের চেম্বারের দিকে যেতে দেখে গুণ্ডা দু'জনকে চিনিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলছিল। গুণ্ডারা আর একবার ভাল করে দেখার জন্য এবং তাকে ফলো করার জন্য সানোয়ার উকিলের চেম্বারের কিছুটা দূরে জয়নালের সাথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল।

জয়নালের সঙ্গে আরিফের পরিচয় না হলেও সে যখন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত তখন এনায়েতপুরে তাকে কয়েকবার দেখেছে। সে কথা জয়নাল জানত না। এখন আরিফের কথা শুনে কি বলবে না বলবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে চুপ করে রইল।

আরিফ বলল, কি চিন্তা করছেন?

ঃ না মানে আমি গ্রামের চাষী মানুষ। আপনার কি এমন উপকার করতে পারব, বলুন?

ঃ তেমন কিছুই না, আপনি খালেক ও মালেককে চেনেন তো?

ঃ জ্বী, চিনি।

আমি সিরাজগঞ্জে রেস্ট হাউসের পনের নাম্বার রুমে আছি। অতি অবশ্য কাল তাদেরকে আমার কাছে আসতে বলবেন।

জয়নাল বলল, জ্বী বলব।

আরিফ সালাম বিনিময় করে চলে গেল।

গুণ্ডা দু'জন এতক্ষণ সরে গিয়ে আড়াল থেকে তাদেরকে লক্ষ্য রাখছিল।

আরিফ চলে যাবার পর একজন তাকে ফলো করল। আর একজন জয়নালের কাছে' এসে বলল, আরিফ সাহেব আপনাকে কি বললেন?

জয়নাল সব কিছু চেপে গিয়ে শুধু বলল, আমাকে উনি চেনেন। তাই সাজ্জাদ সাহেবদের কে কেমন আছে জিজ্ঞেস করছিলেন।

গুণ্ডাটা জয়নালকে বলল, আপনার কাজ শেষ, এখানে আর আপনি আসবেন না। সাজ্জাদ সাহেবকে আমাদের পাওনা টাকা রেডী রাখতে বলবেন। আমরা দু'এক দিনের মধ্যে তার সঙ্গে দেখা করব।

জয়নাল সেদিন ফিরে এসে সাজ্জাদকে গুণ্ডাদের কথা বলল, তারপর খালেক ও মালেকের সঙ্গে দেখা করে বলল, আমি সিরাজগঞ্জে একটা দরকারে গিয়েছিলাম। সাজ্জাদ সাহেবের চাচাতো ভাই আরিফ সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি তোদেরকে তার সঙ্গে কালই দেখা করতে বলেছেন। সিরাজগঞ্জ রেস্ট হাউসের পনের নাম্বার রুমে আছেন।

সাজ্জাদ জয়নালের মুখে সবকিছু শুনে একটা চিঠিতে বিস্তারিত সবকিছু লিখে একজন বিশ্বস্ত লোককে সমেশপুরে রফিকের কাছে পাঠাল।

রফিক চিঠি পেয়ে টাকা নিয়ে পরের দিন এনায়েতপুরে সাজ্জাদের সঙ্গে দেখা করল।

সাজ্জাদ বলল, তুমি দু'তিনদিন আমাদের বাড়িতে থাক। কাজ শেষ হবার পর যাবে। চিন্তা করো না, এখানকার সবাই জানবে ঢাকা থেকে আমার এক বন্ধু বেড়াতে এসেছে।

চুনি আর পান্না সিরাজগঞ্জ টাউনের নামকরা গুণ্ডা। গোটা টাউন তাদের ভয়ে কম্পমান। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ও খুন-খারাবি তাদের নিত্যদিনের কাজ। ছোট-বড় ব্যবসায়ীরা তাদেরকে মাসিক চাঁদা দেন। থানার সঙ্গে তাদের শালা দুলা ভাই সম্পর্ক। আরো যে সমস্ত ছোট-খাট গুণ্ডা আছে, তারাও তাদেরকে মাসোহারা দেয়। এখানকার সব হোটেলের মালিক ও ম্যানেজার তাদেরকে সমীহ করেন। প্রত্যেক মাসে চাঁদাও দেন।

চুনি ফলো করে আরিফের থাকার ঠিকানা জেনে নিয়ে পান্নাকে জানাল।

পান্না বলল, হোটেলে খুন করা যাবে না। বাইরেই কাজটা সারতে হবে। আমরা সব সময় ওকে ফলো করার। তারপর সুযোগ মত কাজ সারব।

আরিফ জয়নালের হাবভাব দেখে বুঝতে পেরেছে, এখানেও কিছু ষড়যন্ত্র আছে। তাই খুব সাবধান হয়ে গেল। হোটেল থেকে বাইরে বের হল না। হোটেলের ম্যানেজার ও বয়দের বলে রাখল, কেউ যদি তার খোঁজ করে, তাহলে তাকে রিস্পেশনে বসিয়ে আমাকে খবর দেবেন। কাউকেই রুমে যেতে দেবেন না।

পরের দিন বেলা এগারটার সময় খালেক ও মালেক হোটেলে এলে ম্যানেজার জিজ্ঞেস করলেন, কাকে চান?

খালেক বলল, পনের নাম্বার রুমে আরিফ সাহেব আছেন। উনি আমাদেরকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

ম্যানেজার তাদের বসতে বলে একজন বয়কে আরিফকে ডেকে নিয়ে আসতে বললেন।

আরিফ অফিস রুমে এসে খালেক ও মালেককে রুমে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে তিন হাজার টাকা দিয়ে বলল। তোমরা এ থেকে আড়াই হাজার সাজ্জাদকে দিয়ে দিবে। আর বাকি টাকা তোমাদের ছেলেমেয়েকে মিষ্টি খেতে দিলাম। তারপর তাদেরকে নাস্তা খাইয়ে বিদায় দেবার সময় জিজ্ঞেস করল, এখানকার নামকরা গুণ্ডাদেরকে তোমরা চেন।

মালেক বলল, জ্বী চিনি। তারা হল, চুনি ও পান্না। ওদের সবাই চেনে। এমন দুষ্কর্ম নেই যা ওরা করতে পারে না। ওদের নামে থানায় অনেক কেস আছে। কিন্তু পুলিশদের ওরা হাত করে রেখেছে। আসবার সময় রাস্তার মোড়ে তাদেরকে দেখে এলাম। আপনি সাবধানে থাকবেন।

আরিফ বলল, ঠিক আছে, তোমরা যাও।

খালেক ও মালেক ফিরে এসে সেই দিনই সাজ্জাদকে টাকা দিয়ে দিল।

সাজ্জাদ বলল, তোরা এত টাকা পেলি কোথায়?

খালেক বলল, তা জানার আপনার দরকার কি? আপনি আপনার টাকা পেলেন, আর আমরাও ঋণমুক্ত হলাম। বলা বাহুল্য সেই থেকে খালেক ও মালেক আরিফের কথামত দৈহিক পরিশ্রম করে সংসার চালাচ্ছে। ঠিকমত নামাজও পড়ছে। তারপর তারা চলে গেল।

এদিকে চুনি ও পান্না আজ দু'দিন হোটেলের অনতিদূরে একটা রেস্টুরেন্ট থেকে আরিফের বাইরে বেরোবার অপেক্ষায় করেছে। তৃতীয় দিন বেলা দশটার দিকে বেরোতে দেখে পিছু নিল। তাদের ইচ্ছা তাকে কিডন্যাপ করে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে খুন ব। তাই সুযোগ পেয়েও রাস্তায় গুলি করল না।

আরিফের কোর্টের কাজ সারতে প্রায় দু'টো বেজে গেল। কোর্ট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় একটা রিক্সায় উঠতে যাবে এমন সময় চুনি ও পান্না জামার ভেতর থেকে তার দু' পাশের শরীরে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলল, চিৎকার করলে আপনার শরীরে দু'টো ফুটো তৈরি হবে। ভাল ছেলের মত ঐ বেবীতে উঠে পড়ুন।

আরিফ ব্যাপার বুঝতে পেরে তড়িৎগতিতে দু'জনের থুতনীতে দু'হাতের কুনুই চালাল।

চুনি আর পান্না হাত দুই উপরে উঠে ছিটকে পড়ল। কিন্তু তারা টাল সামলে নিয়েই ফায়ার করল। একজনের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আর একজনের গুলি আরিফের ডান হাতের নিচের পাঁজরে লাগল। সেই অবস্থাতে আরিফ চুনিকে ধরে শূন্যে তুলে পান্নাকে আঘাত করল। পান্না মাটিতে পড়ে গেল, আর তার হাত থেকে পিস্তল ছুটে গেলে আরিফ তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে চুনির দিকে বাগিয়ে ধরে বলল, খবরদার নড়েছ কি তোমার কপাল ফুটো করে দেব। চুনি কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত না করে গুলি চালাল, গুলি চালাবার আগে আরিফ তার পিস্তল ধরা হাতের বাজুতে গুলি করেছে। ফলে চুনির গুলিটা আরিফের বাঁ পাঁজর ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। চুনির হাতে গুলি লাগাতে তার হাতের পিস্তল পড়ে গেছে। চুনি বাঁ হাত দিয়ে পিস্তলটা নিতে গেলে আরিফ বলল, পিস্তল ধরবে না। ধরলে ঐ হাতটার বাজুও ফুটো করে দেব। চুনি হাত টেনে নিল। আরিফ এগিয়ে এসে পিস্তলটা কুড়িয়ে পিস্তলের বাঁট দিয়ে চুনির গর্দানে খুব জোরে আঘাত করল। চুনি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ততক্ষণে পান্না সামলে উঠে আরিফকে আক্রমণ করার জন্য ছুটে এল। আরিফ তার বুকে ফ্লাইং কিক মারতে কয়েক হাত দূরে পড়ে গেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কাজটা ভাল করলেন না আরিফ সাহেব, এর জন্য আপনাকে পস্তাতে হবে। আরিফ তার ডান হাতের বাজুতে গুলি করে বলল, দু'জনের শুধু দু'টো হাত কেটে দেবার ব্যবস্থা করলাম। আবার যদি শুধু আমার নয় অন্য কারো ক্ষতি কর, তাহলে বাকি দু'টো হাতও কেটে দেবার ব্যবস্থা করব।

গুলির আওয়াজ পেয়ে লোকজন রাস্তা থেকে সরে গিয়ে দূর থেকে ঘটনাটা দেখছিল। কেউ সাহস করে এগিয়ে এল না। আরিফের যেখানে গুলি গেলেছিল, সেখান থেকে রক্ত বেরিয়ে তার জামা-কাপড় ভিজে যাচ্ছে। সে পিস্তল দু'টো এক হাতে নিয়ে অন্যহাতে জখমের জায়গাটা চেপে ধরে রেখে লোকজনের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, পুলিশকে খবর দেবার মত আল্লাহর এমন কোন বান্দা কি এখানে নেই?

কোর্টে যে কয়জন পুলিশ ছিল, তারা চুনি ও পান্নার ফ্যানচাটা। তারাও এতক্ষণ দৃশ্যটা দেখছিল। এবার এগিয়ে এল, তাদেরকে দেখে আরিফ বলল, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলেন, না? আপনাদের সহযোগিতায় এরা বিভিন্ন অপরাধ করে বেড়াচ্ছে। এদের নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে তো ছেড়ে দেবেন?

এমন সময় শরীফ দারোগা জীপে করে কয়েকজন পুলিশ নিয়ে সেখানে এলেন। ইনি মাত্র একমাস হল এখানে বদলী হয়ে এসেছেন। অত্যন্ত সৎ ও বুদ্ধিমান লোক। এখানে আসার পর থানার অরাজকতা দেখে খুব মর্মাহত হয়েছেন। সবাইকে তিরস্কার করে সৎ উপদেশ দিয়েছেন। রেকর্ড পত্র দেখে চুনি ও পান্নার সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছেন। একজন লোক থানায় এসে চুনি-পান্নার গোলমালের কথা জানাতে তিনি নিজে পাঁচ ছয়জন পুলিশ নিয়ে এসেছেন। আরিফের শেষের দিকের কথা কিছু শুনে পুলিশদেরকে ওদের তিনজনকে অ্যারেস্ট করার অর্ডার দিয়ে আরিফকে উদ্দেশ্য করে বললেন, পুলিশদের মধ্যে কিছুসংখ্যক খারাপ থাকলেও ভাল লোকও আছে। আমি এদের দু'জনের সব খবর নিয়েছি। এবার ওরা দশ-বিশ বছরেও ছাড়া পাবে কিনা সন্দেহ।

আরিফ পিস্তল দু'টো শরীফ দারোগার হাতে দিয়ে বলল, আল্লাহ ন্যায় বিচারককে খুব ভালবাসেন। তারপর সে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

শরীফ দারোগা সবাইকে নিয়ে সদর হাসপাতালে গেলেন। সেখানে অপারেশন করে সবার গুলি বের করা হল। চুনি ও পান্নার দু'জনের একটা করে হাত কেটে বাদ দিতে হয়েছে। হাসপাতালে তাদের বেডের কাছে কড়া পুলিশ পাহারা রইল। শরীফ দারোগা মাঝে মাঝে আরিফের মুখ জবানী নেবার জন্য জ্ঞান ফিরেছে কিনা এসে দেখে যেতে লাগলেন।

পরের দিন খবর পেয়ে গোফরান সাহেব ও সুফিয়া বেগম হাসপাতালে এলেন। কিন্তু পুলিশ তাদেরকে আরিফের বেডের কাছে যেতে দিলেন না। সানোয়ার উকিলের সঙ্গে গোফরান সাহেবের খুব জানাশোনা। তাকে ধরে গোফরান সাহেব থানায় গিয়ে শরীফ দারোগার কাছে পরিচয় দিয়ে আরিফকে দেখার পারমিশন নিলেন। কিন্তু বেডের কাছে থাকার পারমিশন পেলেন না। ওঁরা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করলেন। মাঝে মাঝে এসে আরিফকে দেখে যেতে লাগলেন। সুফিয়া বেগম কেঁদে কেঁদে আল্লাহপাকের কাছে আরিফকে ভাল করে দেবার জন্য দোওয়া করতে লাগলেন।

আরিফ যেদিন আহত হয়, সেদিন ফাল্গুনী দুপুরে খাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে নজীবর রহমানের প্রেমের সমাধি বইটা পড়ছিল। "বিয়ের রাত থেকে স্বামী দিনরাত্র নিষিদ্ধ পল্লীর একটা মেয়ের কাছে থাকত। স্ত্রী তাহমিনা এক নজরও স্বামীকে দেখেনি। তবু স্বামীর প্রতি তাহমিনার গভীর ভালবাসার কথা পড়ে ফাল্গুনীর চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ল।" ঠিক তখনই তার আরিফের কথা মনে পড়তে বুকের মধ্যে যন্ত্রণা অনুভব করল। যন্ত্রণাটা ক্রমশ বেড়েই চলছে বুঝতে পেরে তার মনে হল, আরিফের নিশ্চয় কোন বিপদ হয়েছে। জোহরের নামাজ পড়ে ভাত খেয়েছে। তার অজু এখনো ভাঙেনি। আস্তে আস্তে নামাজ পাটি বিছিয়ে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে দোয়া করল, "আল্লাহপাক, তুমি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান এবং দয়ার সাগর। তোমার দয়া ব্যতীত কোন প্রাণী এক মুহূর্ত বাঁচতে পারে না। কেন জানি আমার মনে হচ্ছে, আরিফের কোন বিপদ হয়েছে। আমার এই নামাজের অসিলায় তুমি আরিফকে সহিসালামতে রেখ। যদি সে কোন বিপদে পড়ে, তাকে তুমি রক্ষা করো। তোমার রাসুলে পাক (দঃ)-এর উপর শতকোটি দরুদ ও সালাম পেশ করে ফরিয়াদ করছি, তোমার রহমত দিয়ে আরিফকে ঢেকে রেখ। আমি তিন জুম্মা নফল রোজা রাখব। সে যেন সুস্থ শরীরে ফিরে আসে। আমিন সুম্মা আমিন।" তারপর নামাজ পাটি গুটিয়ে রেখে আরিফকে চিঠি লিখল।

প্রাণপ্রিয় আরিফ,

প্রথমে আমার শতকোটি সালাম নিয়ো। পরে প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা গ্রহণ করো। আর তোমার আব্বা-আম্মার পবিত্র কদমে আমার সালাম বলবে। তুমি দেশে যাবার পর তোমার স্মৃতির ব্যথা বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলাম; কিন্তু আজ এই মুহূর্ত থেকে ব্যথাটা অসহ্য যন্ত্রণায় পরিণত হয়েছে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, তোমার কোন বিপদ হয়েছে। তাই আল্লাহপাকের কাছে তোমার সহিসালামতের জন্য দোয়া চেয়ে থাকতে না পেরে এই পত্র লিখছি। তোমার যদি আসতে দেরি থাকে, তাহলে পত্র পাওয়া মাত্র পত্র দিয়ে জানাবে। নচেৎ আমি লজ্জার মাথা খেয়ে এসে পড়ব। তোমার চিন্তায় আমি খুব বেচায়েন হয়ে আছি। আর একবার তোমাকে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা জানিয়ে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে তোমার সহিসালামতের জন্য দোওয়া চেয়ে শেষ করছি।

ইতি
তোমারই ফাল্গুনী

পরের দিন সকালে ফাল্গুনী নাস্তার টেবিলে পেপারে আহত আরিফের ছবি দেখে চমকে উঠল। তারপর ঘটনাটা পড়ে চোখের পানি রোধ করতে পারল না। পেপারটা আব্বার দিকে এগিয়ে দিয়ে ভিজে গলায় আতঙ্কিত স্বরে বলল, আরিফ দুষ্কৃতকারীদের হাতে আহত হয়ে হাসপাতালে আছে।

ইলিয়াস সাহেবও চমকে উঠে পেপার পড়ে খুব চিন্তিত হয়ে বললেন, আরিফের সৎ সাহস দেখে খুব অবাক হচ্ছি। দু'জন নামকরা গুণ্ডার সঙ্গে মোকাবেলা করা কম সাহসের পরিচয় নয়।

ফাল্গুনী বলল, আব্বা, আরিফকে দেখতে যাবে না?

ইলিয়াস সাহেব বললেন, যাব না মানে! নিশ্চয় যাব! তারপর ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলে মেয়েকে বললেন, তুই তৈরি হয়ে নে, আমিও তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

বিকেলে তারা সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালে এসে পৌঁছাল।

গোফরান সাহেব ও সুফিয়া বেগম হাসপাতালের বারান্দায় বসে ছিলেন। ইলিয়াস সাহেব সালাম বিনিময় করে আরিফের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন।

গোফরান সাহেব বললেন, অপারেশন করে গুলি বের করা হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন, ভয়ের কোন কারণ নেই; কিন্তু এখনো জ্ঞান ফিরেনি।

ফাল্গুনী সবাইকে কদমবুসি করে সুফিয়া বেগমকে জড়িয়ে ধরে 'আম্মা একি' হল বলে ফুঁপিয়ে উঠল।

সুফিয়া বেগম তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে প্রবোধ দিতে দিতে ভিজে গলায় বললেন, ধৈর্য ধর মা। আল্লাহ পাক বিপদের সময় ধৈর্য ধরতে বলেছেন। তাঁর পাক দরবারে দোয়া কর। তিনি যেন আমাদের আরিফকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে দেন।

ওঁরাও একই হোটেলে থেকে গেলেন। পরের দিন বেলা দশটায় আরিফের জ্ঞান ফিরল।

সানোয়ার উকিল ঘটনার দিন শরীফ দারোগার কাছে ঘটনা জানিয়ে ডাইরী করেছিলেন। আরিফের জ্ঞান ফেরার পর শরীফ দারোগা তার মুখ জবানী নোট করার সময় বুঝতে পারলেন, সানোয়ার উকিল সত্য ঘটনা বলে ডাইরী করিয়েছেন। নোট নেয়া শেষ করে তিনি আরিফকে নির্দোষ ঘোষণা করে পুলিশ প্রহরা উঠিয়ে নিলেন।

সুফিয়া বেগম আরিফকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

আরিফ বলল, আম্মা তুমি কাঁদছ কেন? আল্লাহ পাকের অসীম দয়ায় তোমাদের ছেলে এখন বিপদমুক্ত।

গোফরান সাহেব স্ত্রীকে বললেন, অত ভেঙে পড়ছ কেন? আরিফের জ্ঞান ফিরেছে। আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় কর।

সুফিয়া বেগম আরিফকে ছেড়ে দিয়ে উঠে একপাশে সরে বসলেন।

আরিফ সবার দিকে চাইতে গিয়ে দেখল, ফাল্গুনী তার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আর তার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে।

এমন সময় একজন ডাক্তার ও একজন নার্স এসে বললেন, আপনারা আর এখানে ভীড় করবেন না, চলে যান। বিকেলে আবার আসবেন। রুগী বিপদমুক্ত হলেও বেশি কথা বলা নিষেধ।

সমাপ্ত

বাংলা বই ডাউনলোড

bdeboi.com

bnebookspdf.com

facebook.com/bnebookspdf

fb.com/groups/bnebookspdf